ইসলাম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

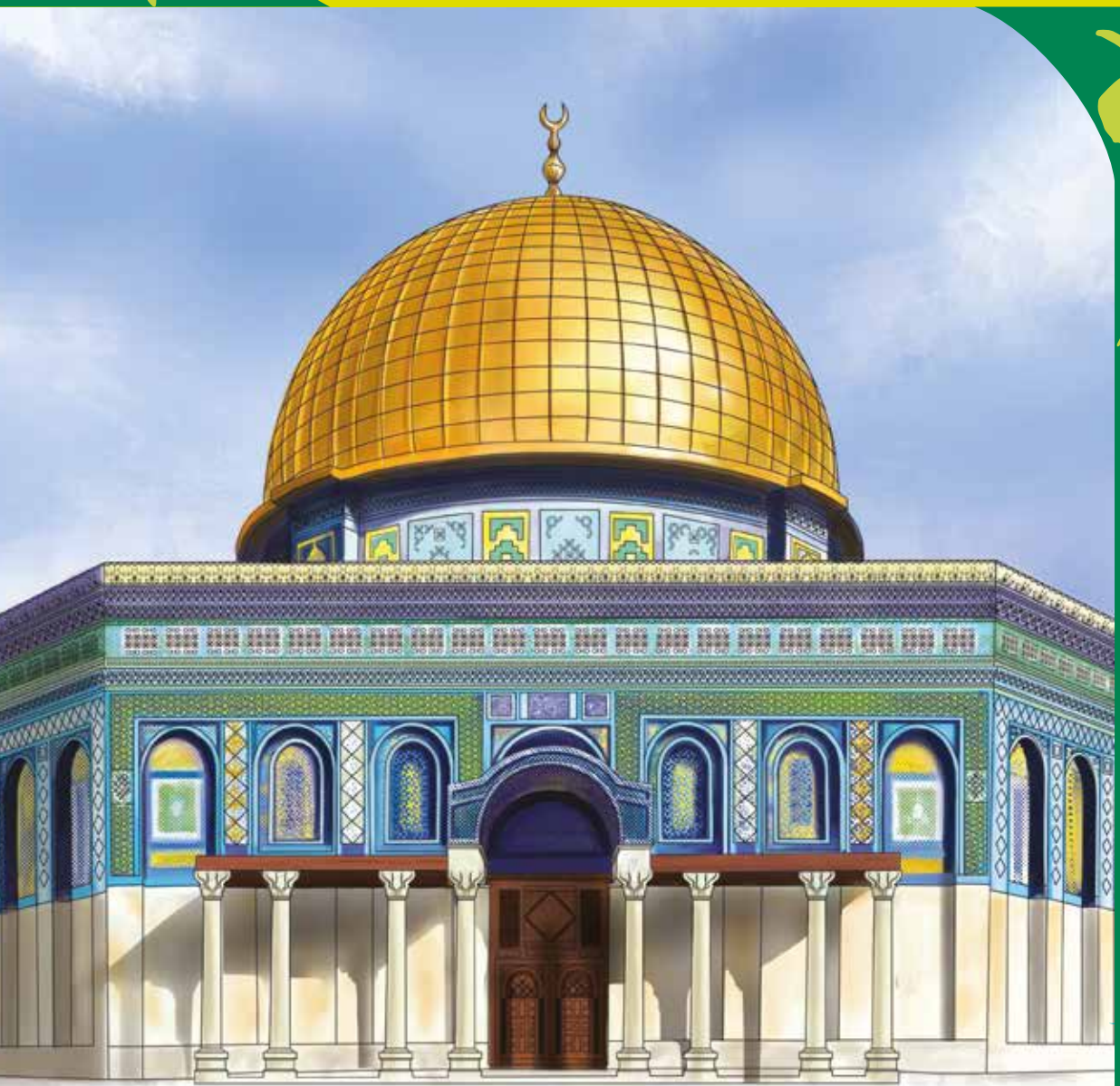

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

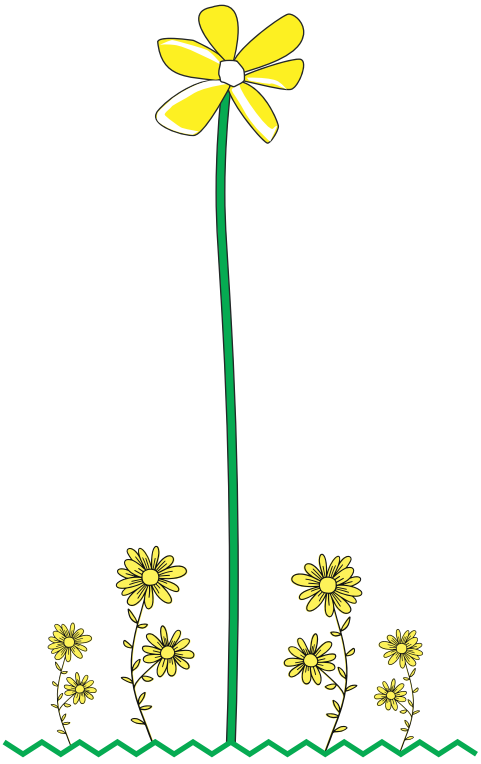

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

রচনা

ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ
ড. আবদুল আলীম তালুকদার
মোঃ শাহরিয়ার শফিক
জয়নব আরা বেগম
মোঃ সালাহ উদ্দিন

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

চিত্রাঙ্কন ও গ্রাফিক্স

মোঃ আব্দুর রহমান

প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করাও এই স্তরের শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসরণ ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনদের চাহিদা ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল ও ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটির প্রতি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

পঞ্চম শ্রেণির 'ইসলাম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে সাধারণত দশ বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠগ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। পাঁচটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ ও সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**আকাইদ ও ইবাদত**	**১-৩৫**
	মহান আল্লাহ ও তার একত্ববাদ	১-৪
	শিরক	৪-৬
	সালাত	৭-১২
	সাওম	১৩-১৫
	জাকাত	১৫-১৮
	হজ	১৮-২১
	কুরবানি	২১-২৩
	পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত	২৩-৩১
	সূরা আল-কাওসার	৩২
	অনুশীলনী - ১	৩৩-৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	**নবি, রাসুল ও মহানবি (স.)-এর সাহাবিগণের জীবনচরিত**	**৩৬-৫৩**
	হজরত দাউদ (আ.)	৩৬-৩৮
	হজরত ঈসা (আ.)	৩৮-৪০
	মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.)	৪০-৪৪
	হজরত উসমান (রা.)	৪৫-৪৭
	হজরত আলী (রা.)	৪৭-৪৯
	হজরত ফাতেমা (রা.)	৫০-৫১
	অনুশীলনী - ২	৫২-৫৩
তৃতীয় অধ্যায়	**নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন**	**৫৪-৬৫**
	আত্মত্যাগ	৫৪-৫৬
	পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ	৫৭-৫৮
	পরমতসহিষ্ণুতা	৫৯-৬০
	দেশপ্রেম	৬১-৬৩
	অনুশীলনী - ৩	৬৪-৬৫
চতুর্থ অধ্যায়	**ধর্মীয় সম্প্রীতি**	**৬৬-৭১**
	ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিচয় ও গুরুত্ব	৬৬
	মদিনা সনদ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি	৬৭-৬৯
	অনুশীলনী - ৪	৭০-৭১
পঞ্চম অধ্যায়	**জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা**	**৭২-৮০**
	জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব	৭২-৭৫
	মানুষ ও জীবজগতের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা	৭৫-৭৮
	অনুশীলনী - ৫	৭৯-৮০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ ও ইবাদত

মহান আল্লাহ ও তার একত্ববাদ

আমরা আমাদের চারপাশের সৃষ্টিজগৎকে পর্যবেক্ষণ করি। এবার বলি নিচের কোন কোন সৃষ্টি একই নিয়মে সুশৃঙ্খলভাবে চলে?

চন্দ্র	সূর্য	পৃথিবী
দিন	রাত	ঋতু
গ্রহ	নক্ষত্র	তারকারাজি

আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছি যে, উপরে উল্লিখিত সৃষ্টিগুলো সবই একই নিয়মে চলে। প্রতিদিন পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। দিনের পর রাত এবং রাতের পরে আবার দিন আসে। ঋতুর ক্ষেত্রে গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা, তারপর আসে শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এই ধারাবাহিকতার কোনো ব্যতিক্রম হয় না। তারা সব একই নিয়মে চলে। তাদের জন্য এই নিয়ম কে সৃষ্টি করেছেন? সৃষ্টিজগতের এই শৃঙ্খলার পেছনে কে আছেন?

চিত্র: মহান আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতি ও জীবজগৎ

এসব সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। আমাদের পৃথিবী এই বিশাল বিশ্বজগতের সামান্য অংশমাত্র। বড়ো বড়ো গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা, গ্যালাক্সি এ বিশ্বজগতে বিরাজমান। এগুলোর প্রত্যেকটিই সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই শৃঙ্খলার পেছনেও আছেন মহান আল্লাহ। তিনি একাই নিয়ন্ত্রণ করেন এই বিশ্বজগৎ। ফলে এখানে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই বরং সবকিছুতে একটা ঐক্য রয়েছে।

আমরা আমাদের চারপাশে নানারকম জিনিস দেখতে পাই। সুন্দর ফুল-ফল, গাছপালা, তরুলতা, পশু-পাখি ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি। আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না এমন অনেক বস্তু ও প্রাণী রয়েছে। এসবকিছু সৃষ্টিজগতের অন্তর্গত। এগুলো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজে থেকে সৃষ্টি হয়নি। আমাদের চারপাশে রয়েছে নানারকম পশু-পাখি। কাক আমাদের অতি পরিচিত পাখি। কাক সবসময় কা কা করে ডাকে। সে কখনো কোকিলের মতো ডাকে না। আবার গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল সবাই নিজ নিজ স্বরে ডাকে। আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি, কেন এমন হয়? কেন এক পশু আরেক পশুর স্বরে ডাকে না? কেন এই নিয়ম বা শৃঙ্খলার কোনো ব্যতিক্রম হয় না?

কারণ এসব কিছুর পেছনে রয়েছেন মহান আল্লাহ। তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক। মহাজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা তারই দান। এসব কিছুতে যদি একের বেশি নিয়ন্ত্রক থাকত, তবে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। মহান আল্লাহ বলেন–

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

উচ্চারণ: লাও কানা ফীহিমা আলিহাতুন ইল্লাল্লাহু লাফাছাদাতা।

অর্থ: যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ (উপাস্য) থাকত তবে উভয়ে (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী) ধ্বংস হয়ে যেত। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২২)

একটু চিন্তা করলে আমরা বিষয়টি বুঝতে পারব। যেমন– মহাজগতের সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা যদি একাধিক হতেন, তাহলে একজন চাইতেন সূর্য পূর্বদিকে উঠুক, আরেকজন চাইতেন পশ্চিম দিকে উঠুক। আবার অন্যজন হয়ত চাইতেন দক্ষিণ বা উত্তর দিকে উঠুক। ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। একাধিক নিয়ন্ত্রক থাকলে বিশ্বজগতের সুন্দর সুশৃঙ্খল অবস্থা বিনষ্ট হয়ে যেত। বাস্তবে সেরকম হয় না। এই অবস্থা একথাই প্রমাণ করে যে, বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রক একজনই। আর তিনি হলেন মহান আল্লাহ। তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পালনকর্তা। তার হুকুম ও নিয়মেই সবকিছু পরিচালিত হয়। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

চিত্র: মহান আল্লাহর সৃষ্টি সুন্দর পৃথিবী

মহান আল্লাহ নিজ সত্তা, গুণাবলি ও কর্মে এক ও অদ্বিতীয় -এই বিশ্বাসকে তাওহিদ বলে। তাওহিদ (تَوْحِيْدٌ) আরবি শব্দ। এর অর্থ একত্ববাদ। তাওহিদ ইমানের মূল ভিত্তি। এর তাৎপর্য হলো এরূপ বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। এই বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে তার কোনো অংশীদার বা সমকক্ষ নেই। অন্য কেউ তার মর্যাদায় আসীন হতে পারে না। তিনি সব ক্ষেত্রে পূর্ণতার অধিকারী। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা ইখলাসে তার একত্ববাদের পরিচয়সমূহ বর্ণনা করে বলেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ	اَللّٰهُ الصَّمَدُ	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ	وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

উচ্চারণ: কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ: (হে নবি) আপনি বলুন! তিনিই আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তার কোনো সমকক্ষও নেই। (সূরা আল-ইখলাছ, আয়াত: ১-৪)

তাওহিদ বা মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস আমাদেরকে এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে এক হতে শেখায়; মিলেমিশে বসবাস করতে প্রেরণা জোগায়। এক আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র তিনিই আমাদের প্রভু। আমরা সবাই একমাত্র তারই উপাসনা করি। এ ধরনের চেতনা আমাদের মধ্যে এক হওয়ার প্রেরণা নিয়ে আসে। ফলে আমরা এক জাতি হিসেবে বসবাস করতে উদ্বুদ্ধ হই। সুতরাং আমরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করব। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করব।

ক) সৃষ্টিজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ করে মহান আল্লাহর তাওহিদ (একত্ববাদ) সম্পর্কে চিন্তা করি। কোন কোন বিষয় দেখে বুঝতে পারি যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়? সেগুলো নিচের তালিকায় লিখি। কাজটি একাকী করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

খ) সূরা আল-ইখলাস -এর আলোকে আল্লাহর তাওহিদের পরিচয়সমূহ চিহ্নিত করে একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

গ) দৈনন্দিন জীবনে আমরা কীভাবে মহান আল্লাহর তাওহিদের চেতনার অনুশীলন করতে পারি সে সম্পর্কে দলে আলোচনা করি। এরপর উপায়গুলো নিচের ছকে লিখি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

শিরক

আগের পাঠে আমরা আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহিদ সম্পর্কে জেনেছি। তাওহিদের বিপরীত হলো শিরক। এ পাঠে আমরা শিরক সম্পর্কে জানব। শিরক (**الشِّرْك**) আরবি শব্দ। এর অর্থ অংশীদার করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। মহান আল্লাহর সঙ্গে তার ইবাদতে কাউকে শরিক করা বা তার গুণাবলিতে কাউকে অংশীদার করা হলো শিরক। যেকোনো দিক থেকে কাউকে তার সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলে। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে মুশরিক (**مُشْرِكٌ**) বলা হয়।

শিরক দুই প্রকার। বড়ো শিরক ও ছোটো শিরক। বড়ো শিরক হলো প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে মহান আল্লাহর

সঙ্গে অন্য কারো উপাসনা করা। যেমন– মূর্তিপূজা, মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া, কুসংস্কার বা যাদুতে বিশ্বাস করা, ভাগ্য গণনা করা ও ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস করা ইত্যাদি। ছোটো শিরক হলো সূক্ষ্মভাবে মহান আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করা। যেমন– রিয়া করা বা লোক দেখানো ইবাদত করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তার দেওয়া নিয়ামতই আমরা ভোগ করি। তাই মহান আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। শিরক অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধ। পৃথিবীতে যত প্রকারের জুলুম আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হলো শিরক। মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

উচ্চারণ: ইন্নাশশিরকা লাজুলমুন আজীম।

অর্থ: নিশ্চয়ই শিরক অনেক বড়ো জুলুম (চরম অন্যায়)। (সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩)

এই আয়াতে শিরক করাকে বড়ো জুলুম বলা হয়েছে। একজনের অধিকার অন্যকে দিয়ে দেওয়া জুলুম। তাই এই আয়াতের মর্মার্থ হলো, ইবাদত একমাত্র মহান আল্লাহর অধিকার। অথচ শিরককারী মহান আল্লাহর এই অধিকারে অন্যকে অংশীদার বানায়। এ হিসেবে শিরক চরম জুলুম। মহান আল্লাহ তার সঙ্গে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না।

মানব জাতিকে শিরক থেকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। পূর্ববর্তী সকল নবি ও রাসুল শিরক পরিহার করার জন্য তাঁদের উম্মতদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) নিজেও শিরক পরিহার করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রখ্যাত সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন– "মহানবি (স.) বলেছেন, তোমরা ৭টি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাকো। তাঁরা জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসুল! সেগুলো কী? রাসুল (স.) বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা; জাদু করা; আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন এমন কাউকে হত্যা করা; সুদ খাওয়া; এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা; জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা; সচ্চরিত্র, বিশ্বাসী ও সরলমনা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা।" (সহিহ বুখারি)

শিরক করার মাধ্যমে মানুষ বহু উপাস্যের উপাসনা করে। তারা নিজ নিজ উপাস্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এভাবে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে তাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়। তারা ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়। এভাবে তারা একে অন্যের ওপর অত্যাচার করে। এ কারণেও শিরক বড়ো জুলুম। শিরকের পরিণতি হয় ভয়াবহ। এতে মানুষের একতা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। মহানবি (স.) আমাদেরকে শিরক থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলেছেন এবং নিম্নের দু'আ পড়তে বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَ اَنَا اَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা-আ'লামু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে আপনার সঙ্গে শিরক করা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই এবং মনের অজান্তে যদি (শিরক) হয়ে যায়, তার থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চাই। (মুসনাদে আহমাদ)

আমরা অবশ্যই শিরক থেকে বেঁচে থাকব। ইচ্ছাকৃতভাবে শিরক হয় এমন কোনো কাজ করব না। ভুলক্রমে শিরক হয়ে গেলে তওবা করে তা থেকে ফিরে আসব এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব। এভাবে শিরক থেকে বেঁচে আমরা তাওহিদের পথে থাকব। তাহলেই আমরা মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারব। আমাদের ইহকাল ও পরকাল কল্যাণকর হবে।

ক) শিরক সম্পর্কে আলোচনা করে শিরক হয় এমন কাজের তালিকা তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

খ) দৈনন্দিন জীবনে শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য করণীয় কাজের একটি তালিকা প্রস্তুত করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

সালাত

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা ইবাদত কী, তা জেনেছি। সালাতের পরিচয়, সালাতের আহকাম ও আরকান এবং সালাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে জেনেছি। এ শ্রেণিতে আমরা সালাতের ওয়াজিব, তাশাহহুদ, দু'আ কুনুত এবং মুনাজাতের দু'আ সম্পর্কে জানব।

সালাতের ওয়াজিব

সালাত আদায়ের জন্য কিছু ফরজ ও ওয়াজিব কাজ রয়েছে। ফরজ কাজগুলোকে বলে আহকাম ও আরকান। এধরনের কাজ ১৩টি। এ সম্পর্কে আমরা ৪র্থ শ্রেণিতে বিস্তারিত জেনেছি। এ শ্রেণিতে আমরা সালাতের ওয়াজিব সম্পর্কে জানব।

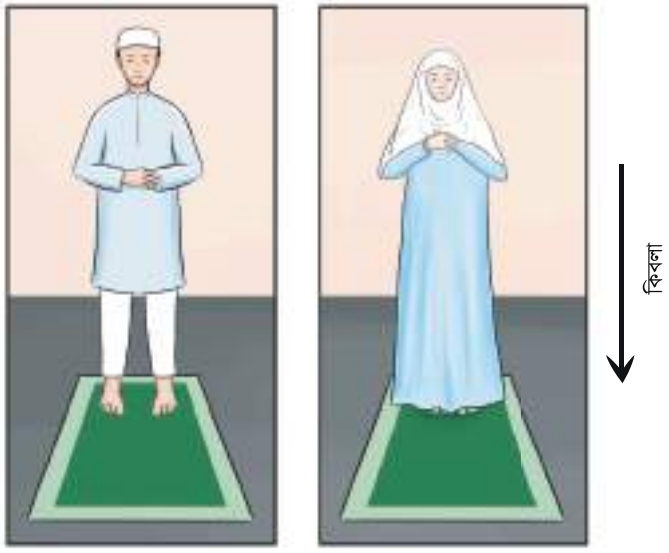

চিত্র: সালাত আদায়

ওয়াজিব (وَاجِب) আরবি শব্দ। এর অর্থ অপরিহার্য কাজ। সালাতের ওয়াজিব ১৪টি। যথা–

১. প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা।
২. সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা অথবা ন্যূনতম ছোটো তিন আয়াত বা বড়ো এক আয়াত তিলাওয়াত করা।
৩. ফরজ ও ওয়াজিবসমূহের মধ্যে ধারাবাহিকতা (তারতিব) রক্ষা করা।
৪. রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
৫. দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা।
৬. তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতে দ্বিতীয় রাকাতের পর তাশাহহুদ পাঠ করার জন্য বসা।
৭. উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা।
৮. মাগরিব ও এশার ফরজ সালাতের প্রথম দুই রাকাতে, ফজর ও জুমআর ফরজ সালাতে এবং দুই ঈদের সালাতে সরবে এবং অন্যান্য সালাতে নীরবে ইমামের কুরআন পাঠ করা।

৯. বিতর সালাতে তৃতীয় রাকাতে দু'আ কুনুত পাঠ করা।

১০. দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।

১১. রুকু ও সিজদায় কমপক্ষে এক তাসবিহ পড়ার পরিমাণ সময় অপেক্ষা করা।

১২. পবিত্র কুরআনে ১৪টি আয়াত আছে, যা পাঠ করলে বা শুনলে সিজদা করতে হয়। সালাতে এরূপ কোনো আয়াত পাঠ করলে 'তিলাওয়াতে সিজদা' করা।

১৩. সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা।

১৪. ভুলে কোনো ওয়াজিব বাদ পড়লে শেষ বৈঠকে 'সাহু সিজদা' করা।

সালাতের ওয়াজিবগুলো ফরজের নিচের স্তরের। গুরুত্বের দিক দিয়ে ফরজের পরেই ওয়াজিবের স্থান। তবে এসব কাজের একটি কাজও ইচ্ছা করে বাদ দিলে সালাত আদায় হয় না।

ক) পোস্টার বা ছবি দেখে সালাতের ওয়াজিব সম্পর্কে আলোচনা করি। কাজটি জোড়ায় করি।

খ) সালাতের ওয়াজিবসমূহের একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি একাকী করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	
৯.	
১০.	
১১.	
১২.	
১৩.	
১৪.	

গ) শিক্ষকের সহায়তায় সালাতের ওয়াজিবসমূহ অনুশীলন করে দেখাই। কাজটি দলগতভাবে করি।

তাশাহহুদ

সালাত (নামাজ) আদায় করার জন্য তাশাহহুদ পাঠ করতে হয়। তাশাহহুদ (التَّشَهُّدُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ সাক্ষ্য। এটি আত্তাহিয়্যাতু (التَّحِيَّاتُ) নামেও পরিচিত, যার অর্থ শুভেচ্ছা বা অভিবাদন। একজন সালাত আদায়কারী যখন দ্বিতীয় ও শেষ রাকাতে বৈঠকে বসেন তখন তাশাহহুদ পাঠ করে থাকেন। তাশাহহুদ পাঠ করার মাধ্যমে সালাত আদায়কারী মহান আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে তিনি মহানবি (স.) ও মহান আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের প্রতিও সালাম জানান।

তাশাহহুদ

তাশাহহুদ	উচ্চারণ	অর্থ
التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ	আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাতু	সকল অভিবাদন, ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য।
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ	আসসালামু ‘আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু	হে নবি! আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ	আসসালামু আলাইনা ওয়া ‘আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন	আমাদের ও আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ	আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহু ওয়া রাসুলুহু	আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স.) তার বান্দা ও রাসুল।

ক) শিক্ষকের সঙ্গে সঠিক উচ্চারণে অর্থসহ তাশাহহুদ পাঠ করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

দু'আ কুনুত

সালাত আদায়ের সময় বিভিন্ন দু'আ পাঠ করতে হয়। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো দু'আ কুনুত। এই দু'আটি বিতরের নামাজে পাঠ করতে হয়। ইশার সালাতের পর থেকে শেষ রাতের পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো সময়ে বিতর নামাজ আদায় করা যায়। এ সালাতের তৃতীয় রাকাতে কিরাত পড়ার পর দু'আ কুনুত পড়তে হয়। কুনুত (اَلْقُنُوْتُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ বিনয় বা আনুগত্য। দু'আ কুনুত পাঠ করার উদ্দেশ্য হলো নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য, ক্ষমা ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করা। এই পাঠে আমরা সঠিক উচ্চারণে দু'আ কুনুত পড়া শিখব।

দু'আ কুনুত

দু'আ কুনুত	বাংলা উচ্চারণ	বাংলা অর্থ
اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ	আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা, ওয়া নাসতাগফিরুকা	হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই, তোমারই নিকট ক্ষমা চাই।
وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ	ওয়া নু'মিনু বিকা, ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা,	তোমারই প্রতি ইমান রাখি, তোমারই ওপর ভরসা করি
وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ	ওয়া নুছনি 'আলাইকাল খাইরা	এবং তোমার উত্তম প্রশংসা করি।
وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ	ওয়া নাশকুরুকা, ওয়ালা নাকফুরুকা	আমরা তোমার কৃতজ্ঞ হয়ে চলি, অকৃতজ্ঞ হই না
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ	ওয়া নাখলা'উ ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফজুরুকা	এবং যারা তোমার অবাধ্য হয় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের পরিত্যাগ করি।
اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي	আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী	হে আল্লাহ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই জন্য সালাত আদায় করি।
وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى	ওয়া নাসজুদু, ওয়া ইলাইকা নাছ'আ	তোমার জন্যই সিজদা করি এবং তোমার দিকেই ধাবিত হই।

وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ	ওয়া নাহফিদু, ওয়া নারজু রাহমাতাকা, ওয়া নাখশা ‘আযাবাকা	তোমার হুকুম পালনের জন্যই প্রস্তুত থাকি, তোমার দয়ার আশা করি এবং আমরা তোমার শাস্তিকে ভয় করি।
إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ	ইন্না ‘আযাবাকা বিল কুফফারি মুলহিক্।	নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি কাফিরদের ওপর পতিত হবে।

ক) শিক্ষকের সঙ্গে সঠিক উচ্চারণে অর্থসহ দু‘আ কুনুত পাঠ করি। কাজটি দলে করি।

মুনাজাতের দু‘আ

মুনাজাত (مُنَاجَاة) আরবি শব্দ। এর অর্থ গোপনে কথা বলা, চাওয়া, প্রার্থনা করা, মহান আল্লাহর নিকট নিজের চাহিদা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও রক্ষাকারী। আমাদের উচিত তার নিকট নিজের চাহিদা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তার নিকট কিছু চাওয়ার উত্তম মাধ্যম হলো মুনাজাত। মুনাজাত একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। ফরজ সালাত শেষ হওয়ার পরের মুহূর্তটি দু‘আ কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময়। তাই আমরা সালাত আদায়ের পরে মহান আল্লাহর নিকট দু‘আ করব। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে মুনাজাতমূলক অনেক দু‘আ রয়েছে। এ পাঠে আমরা কয়েকটি মুনাজাতের সহজ দু‘আ সঠিক উচ্চারণে শিখব।

চিত্র: মহান আল্লাহর কাছে মুনাজাত

দু'আ - ১

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ্ দুন্ইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান নার।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দাও, আর আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং দোযখের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০১)

দু'আ - ২

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

উচ্চারণ: রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইললাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্ না মিনাল খাসিরীন।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (সূরা আল-'আরাফ, আয়াত: ২৩)

দু'আ - ৩

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

উচ্চারণ: রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি ছাগিরা।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি (পিতা-মাতা) দয়া করো। যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৪)

দু'আ - ৪

رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

উচ্চারণ: রাব্বি যিদনী ইলমা।

অর্থ: হে আমার রব (প্রতিপালক)! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১১৪)

ক) শিক্ষকের সঙ্গে সঠিক উচ্চারণে অর্থসহ মুনাজাতের দু'আগুলো পাঠ করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

সাওম

সাওমের পরিচয়

ইসলামের পাঁচটি রোকন বা স্তম্ভের মধ্যে সাওম অন্যতম। আরবি সাওম (الصَّوْم) শব্দের অর্থ 'বিরত থাকা'। সাওমকে ফারসিতে রোজা বলা হয়। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও রোজা ভঙ্গ হয় এমন সকল কাজ থেকে বিরত থাকাই সাওম বা রোজা।

সাওমের প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকারের রোজা রয়েছে। যেমন– ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব ও মাকরুহ রোজা। রমজান মাসের রোজা ফরজ। রোজা রাখার মানত করলে তা পালন করা ওয়াজিব। আশুরা ও আরাফার দিনের রোজা সুন্নত। শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা মুস্তাহাব।

রোজার ফরজ ২টি। যথা– নিয়ত করা ও পানাহার থেকে বিরত থাকা।

সাওম ভঙ্গের কারণ

বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে রোজা ভেঙ্গে যায়। রোজা পালনরত অবস্থায় যে সকল কাজ করলে রোজা ভেঙ্গে যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো–

১. ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে।
২. ভুলবশত কোনো কিছু খেয়ে রোজা ভেঙ্গে গেছে ভেবে ইচ্ছে করে আরো কিছু খেয়ে ফেললে।
৩. দাঁতের ফাঁক থেকে ছোলা পরিমাণ কোনো কিছু বের করে খেয়ে ফেললে।
৪. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে।
৫. ইচ্ছাকৃতভাবে ওষুধ সেবন করলে।
৬. ইফতারের সময় হয়েছে মনে করে সূর্যাস্তের আগেই ইফতার করে ফেললে ইত্যাদি।

সাওম পালনরত অবস্থায় করণীয়সমূহ

বিভিন্ন হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে যে, রমজান মাসের ইবাদতে অধিক সাওয়াব লাভ হয়। তাই এ মাসে আমরা একাগ্রচিত্তে যেসব ইবাদত করতে পারি সেগুলো হলো–

১. নিয়ত করা;
২. তারাবির নামাজ আদায় করা;
৩. সাহরি খাওয়া ও ইফতার করা;
৪. ইতিকাফ করা;
৫. লাইলাতুল কদর খোঁজ করা;
৬. অন্যকে ইফতার করানো;
৭. ফিতরা আদায় করা;
৮. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা;
৯. কালিমা পড়া;

১০. নফল ইবাদত করা;
১১. সদকা (দান) করা;
১২. জান্নাত লাভের জন্য প্রার্থনা করা;
১৩. জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া ইত্যাদি।

সাওমের গুরুত্ব

পবিত্র রমজান মাসে রোজা পালন করা ফরজ। এই মাসে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের জন্য মহান আল্লাহ সাওম পালনের আদেশ দিয়েছেন। সাওমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

উচ্চারণ: ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস্ সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন কাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন।

অর্থ: হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হল। যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় সাওম পালনের মূল উদ্দেশ্য হল তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়া (تَقْوَىٰ) আরবি শব্দ। এর অর্থ ভয় করা বা বিরত থাকা। মহান আল্লাহকে ভয় করে সব রকম অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকাই হল তাকওয়া। মহানবি (স.) বলেছেন– "যে লোক মিথ্যা কথা বলা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা পরিহার করল না, আল্লাহর নিকট তার পানাহার বর্জনের কোনো প্রয়োজন নেই।" (সহিহ বুখারি)

দীর্ঘ একমাস সাওম পালনের মাধ্যমে তাকওয়ার অনুশীলন হয়ে থাকে এবং পাপাচার ও লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকা সহজ হয়। এটি আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায়। সাওম পালনকালে মু'মিন ব্যক্তি কু-প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। সাওম পালনের সময় মিথ্যা, প্রতারণা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা, পরচর্চা, ধূমপান ইত্যাদি ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং রমজানের বাইরেও এসব পাপকর্ম ও বদ অভ্যাস ত্যাগ করা সহজ হয়। এজন্য মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) হাদিসে সাওমকে আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সাওম কেবল মহান আল্লাহরই জন্য নিবেদিত। তাই এর পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ দিবেন। হাদিসে কুদসিতে সাওম পালনের পুরস্কার সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন– "সাওম কেবল আমারই জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।" (সহিহ বুখারি)

সাওম পালনের মাধ্যমে মানুষ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। পানাহার ত্যাগের মাধ্যমে ধনীরা দরিদ্রদের অনাহারে-অর্ধাহারে জীবনযাপনের কষ্ট বুঝতে পারে। ক্ষুধার কী কষ্ট, তা তারা অনুভব করতে পারে। তখন তারা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও দান-সদকা করে। সাওম পালনে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। তাই রমজান মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হয়েছে। আর এই ধৈর্যের পুরস্কার হিসেবে জান্নাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় আমরা যথাযথভাবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সাওম পালন করব।

ক) বিভিন্ন প্রকারের সাওমের তালিকা তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

খ) সাওম পালনে বর্জনীয় ও করণীয়সমূহের তালিকা তৈরি করি। কাজটি একাকী করি।

সাওম পালনে বর্জনীয়	সাওম পালনে করণীয়

গ) সাওম -এর পরিচয় সম্পর্কিত পোস্টার তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

জাকাত

জাকাতের পরিচয়

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে জাকাত অন্যতম। জাকাত আদায় করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর সুফল অনেক। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ হয়। সমাজে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত হয়। দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সংহতি রক্ষা হয়। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাকাত (الزَّكٰوة) আরবি শব্দ। এর অর্থ বৃদ্ধি, শুদ্ধিকরণ, পবিত্রকরণ ইত্যাদি। নিসাব পরিমাণ ধনসম্পদ পূর্ণ এক বছর কোনো মুসলমানের মালিকানায় থাকলে জাকাত আদায় করতে হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন–

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَأَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

উচ্চারণ: ওয়া আকিমুস্ সালাতা ওয়া আতুয্ জাকাতা ওয়া আকরিজুল্লাহা কারদান্ হাসানা।

অর্থ: আর সালাত কায়েম করো, জাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। (সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ২০)

যিনি জাকাত প্রদান করেন, তার সম্পদ মহান আল্লাহ বাড়িয়ে দেন। আর যিনি জাকাত গ্রহণ করেন, তার সম্পদও বেড়ে যায়। এ কারণে জাকাতের এক অর্থ হলো বৃদ্ধি। মহান আল্লাহ জাকাত দাতার আত্মা এবং তার ধনসম্পদ উভয়কেই শুদ্ধ ও পবিত্র করে দেন। এজন্য জাকাতের আরেক অর্থ হলো শুদ্ধিকরণ।

জাকাতের নিসাব

জাকাত আদায় করা প্রত্যেক ধনী মুসলমানের ওপর ফরজ বা বাধ্যতামূলক। এর জন্য নিসাব পরিমাণ ধনসম্পদ তার কাছে থাকতে হবে। নিসাব আরবি শব্দ। এর দ্বারা এমন ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ বোঝায় যা থাকলে একজন মুসলমানের ওপর জাকাত ফরজ হয়। নিসাব পরিমাণ সম্পদ অর্জন করার পর থেকে যদি তা পূর্ণ এক বছর কোনো ব্যক্তির কাছে থাকে, তবে তাকে ঐ সম্পদের ওপর জাকাত দিতে হয়। নিম্নোক্ত সম্পদ নিসাব পরিমাণ থাকলে জাকাত দিতে হয়–

১. সোনা, রূপা, নগদ অর্থ ও অলংকার;

২. গৃহপালিত পশু;

৩. জমিতে উৎপন্ন ফসল;

৪. ব্যবসা-বাণিজ্যের পণ্য;

৫. অর্জিত সম্পদ ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার সম্পদে জাকাতের বিভিন্ন নিসাব রয়েছে। স্বর্ণের ক্ষেত্রে জাকাতের নিসাব হলো ‘সাড়ে সাত তোলা’। রূপার ক্ষেত্রে নিসাব হল ‘সাড়ে বাহান্ন তোলা’। এই পরিমাণ সোনা-রূপা থাকলে জাকাত আদায় করতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা বা বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য যদি ৭.৫ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫ তোলা রুপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তাহলে জাকাত দিতে হবে।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ জাকাত দিতে হয়। অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকার জাকাত হয় ২.৫ টাকা। উৎপাদিত ফসল, অন্যান্য দ্রব্যাদি, পশু ইত্যাদির জাকাতও নির্ধারিত হারে প্রদান করতে হয়।

জাকাতের মাসারিফ (খাতসমূহ)

কাদেরকে আমরা জাকাত দিব? সব শ্রেণির লোককে জাকাত প্রদান করা যায় না। কারণ জাকাত হচ্ছে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ধনীদের সম্পদে গরিব ও নিঃস্বদের অধিকার। মহান আল্লাহ বলেন–

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

উচ্চারণ: ওয়াফী আম্ওয়ালিহিম্ হাক্কুল্ লিসসায়িলি ওয়াল্ মাহরূম্।

অর্থ: আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। (সূরা আল-যারিয়াত, আয়াত: ১৯)

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে আটটি খাতকে জাকাত প্রদানের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। খাতগুলোকে 'মাসারিফুয জাকাত' বলে। মাসারিফ আরবি শব্দ। এর অর্থ ব্যয় করার খাত। জাকাতের মাসারিফ বা খাতগুলো হলো–

১. ফকির ব্যক্তি (যার সামান্য পরিমাণ সম্পদ আছে কিন্তু তা দ্বারা তার পারিবারিক খরচ মেটানো সম্ভব হয় না);
২. মিসকিন ব্যক্তি (যার একেবারেই কোনো সম্পদ নেই, নিঃস্ব ব্যক্তি);
৩. জাকাত সংগ্রহ, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি;
৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বা ইমানের ওপর দৃঢ় রাখার জন্য নওমুসলিম ব্যক্তি;
৫. ক্রয়কৃত গোলাম বা দাস মুক্তির জন্য;
৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি;
৭. আল্লাহর পথে নিয়োজিত ব্যক্তি;
৮. মুসাফির ব্যক্তি (ধনী ব্যক্তি সফরে গিয়ে যদি তার পথখরচ শেষ হয়ে যায় তাকেও জাকাত দেয়া যাবে)।

জাকাত আদায়ের সুফল

জাকাত আদায়ের নানা সুফল রয়েছে। জাকাত আদায়কারী ও গ্রহীতার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে জাকাতের প্রভাব রয়েছে। জাকাত প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ সুফলগুলো হলো–

১. জাকাত সম্পদ পরিশুদ্ধ করে;
২. জাকাত দারিদ্র্য বিমোচন করে;
৩. জাকাত উৎপাদন বৃদ্ধি করে;
৪. জাকাত অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে;
৫. জাকাত সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে ইত্যাদি।

জাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন হয়। জাকাতের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। দরিদ্ররা তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় বলে সমাজে চুরি-ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ কমে যায়। ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ হয়। মানসিক প্রশান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। এভাবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য জাকাত বিভিন্ন সুফল বয়ে আনে।

ক) জাকাত সম্পর্কে আলোচনা করি এবং জাকাতের সুফলসমূহের একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

জাকাতের সুফল
১.
২.
৩.
৪.
৫.

হজ

হজের পরিচয়

হজ (الْحَجُّ) শব্দের আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ জিয়ারত করাকে হজ বলে।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হলো হজ। হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত। প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ। সামর্থ্যবান বলতে হজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে হজে যাতায়াতের খরচ বহন করতে সক্ষম ব্যক্তিকে বোঝায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

উচ্চারণ: ওয়া লিল্লাহি ‘আলান্নাছি হিজ্জুল বাইতি মানিছতাতাআ ইলাইহি ছাবিলা।

অর্থ: মানুষের মধ্য থেকে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তাদের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ করা আবশ্যক। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭)

চিত্র: পবিত্র কাবা

হজের কাজসমূহ

হজের ফরজ কাজ ৩টি। যথা–

১. ইহরাম বাঁধা।

২. জিলহজ মাসের ৯ তারিখে আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফে জিয়ারত (১০ জিলহজ কুরবানি ও মাথা মুণ্ডনের পর থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত পবিত্র কাবা শরিফ ৭ বার প্রদক্ষিণ করা।)

হজের ওয়াজিব কাজ ৬টি। যথা–

১. মুযদালিফা নামক স্থানে অবস্থান করা (আরাফাত ময়দান থেকে মিনায় ফেরার পথে মুজদালিফা নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করা)।

২. ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ জামারায় পর্যায়ক্রমে তিনটি নির্ধারিত স্থানে শয়তানের উদ্দেশে কংকর নিক্ষেপ করা।

৩. কুরবানির পর মাথা কামানো বা চুল কেটে ছোটো করা।

৪. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সা'ঈ করা (দৌড়ানো)।

৫. বিদায়ী তাওয়াফ করা (এটি মক্কার বাইরের লোকদের জন্য ওয়াজিব)।

৬. কুরবানি করা (উমরাসহ হজের ক্ষেত্রে)।

হজ ও উমরার প্রথম ফরজ কাজ হলো ইহরাম বাঁধা। মিকাত বা নির্ধারিত স্থানগুলো অতিক্রম করার পূর্বে ইহরাম বাঁধতে হয়। ইহরাম শব্দটি আরবি হারাম শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো কোনো জিনিসকে নিজের ওপর হারাম (নিষিদ্ধ) করে নেওয়া। ইহরামের নির্দিষ্ট পোশাক ও কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। ইহরাম বাঁধতে পুরুষদের সেলাইবিহীন দুই টুকরো সাদা কাপড় আর নারীদের স্বাচ্ছন্দ্যময় শালীন পোশাক পরিধান করতে হয়।

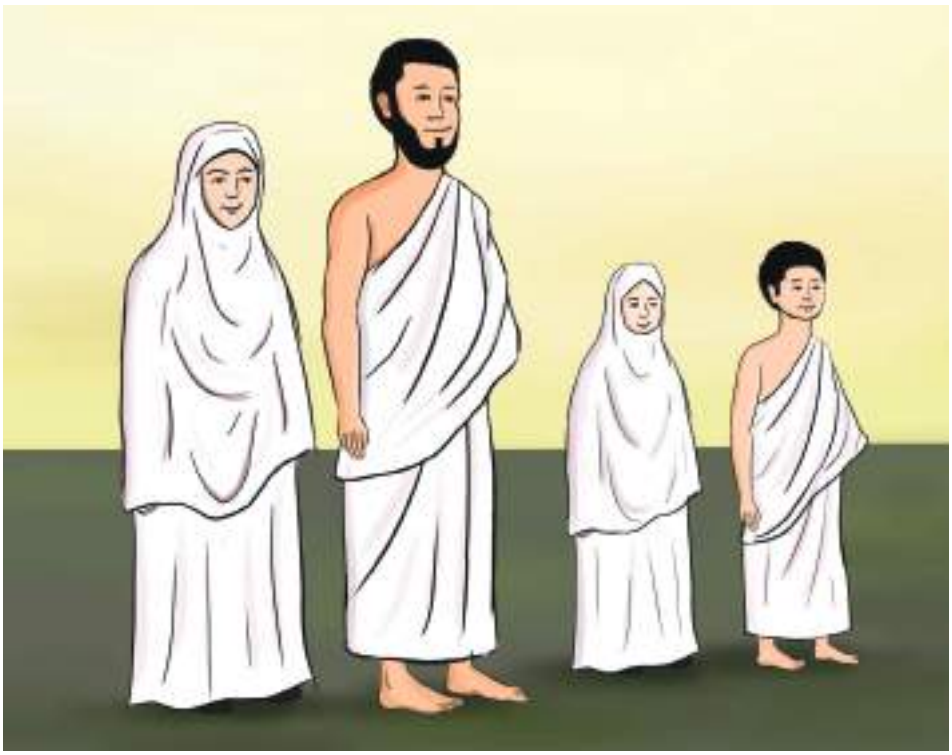

চিত্র: ইহরামের নির্দিষ্ট পোশাক

ইহরাম অবস্থায় হজ ও উমরা পালনকারী ব্যক্তি চুল, হাতের নখ ও গোঁফ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার, সেলাই করা পোশাক পরিধান, প্রাণীহত্যাসহ কিছু বিষয়কে নিজের ওপর হারাম করে নেয়।

ইহরাম শুরু করেই তালবিয়াহর বাক্য পাঠ শুরু করতে হয়। পুরুষদের জন্য তালবিয়াহ উচ্চ আওয়াজে এবং মহিলাদের জন্য নিম্ন আওয়াজে পড়তে হয়। তালবিয়াহ হলো 'লাব্বাইক' বলা। লাব্বাইক শব্দের অর্থ 'আমি উপস্থিত'। তালবিয়াহ দ্বারা হজ ও উমরা পালনকারী ব্যক্তি মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন এবং তার অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করেন। তালবিয়াহর বাক্য হলো–

তালবিয়াহ	উচ্চারণ	অর্থ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ	লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক	আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ	লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক	আপনার কোনো শরিক নেই, আমি হাজির।
اِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ	ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক	নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব আপনার।
لَا شَرِيكَ لَكَ	লা শারিকা লাকা	আপনার কোনো শরিক নেই।

উপরের শব্দসমষ্টি পাঠ করাকে তালবিয়াহ পাঠ বলে। হজ ও উমরায় সব সময় একনিষ্ঠভাবে এই তালবিয়াহ পাঠ করতে হয়।

হজের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব অনেক। হজ পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। হজ আদায়কারী নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়। হজের একটি উল্লেখযোগ্য সুফল হলো এর মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়। হজ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। প্রতিবছর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হজ পালনের জন্য সমবেত হন। হজ ধনী-গরিব, বর্ণ-গোত্র ও জাতীয়তার সব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়। হজে রাজা-প্রজা, মালিক-ভৃত্য সকলে একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত হয়। ফলে হজ তাঁদের মধ্যে সাম্য, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দেয়। আমরা হজ থেকে শিক্ষালাভ করে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হব।

ক) ভিডিয়ো বা ছবি দেখে হজ সম্পর্কে আলোচনা করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

কুরবানি

কুরবানির পরিচয়

ইসলামে কুরবানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আরবি কুরবুন (قُرْبٌ) বা কুরবান (قُرْبَانٌ) শব্দটি ফারসিতে কুরবানি (قُرْبَانِيْ) শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। ঈদুল আযহার সময় এই ইবাদতটি করতে হয়। কুরবানি শব্দের অর্থ 'উৎসর্গ করা'। অর্থাৎ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্যলাভের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণির পশু তার নামে জবেহ করাকে কুরবানি বলে।

প্রথম মানব হজরত আদম (আ.)-এর যুগ থেকেই কুরবানির প্রচলন ছিল। পরবর্তী সকল নবির যুগেও

কুরবানির বিধান ছিল। আমাদের জন্যেও মহান আল্লাহ কুরবানির বিধান দিয়েছেন। হজরত ইবরাহিম (আ.) মুসলিম জাতির পিতা। তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁর প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করতে চেয়েছিলেন। তাই কুরবানির সঙ্গে হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর পুণ্যময় স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

হজরত ইবরাহিম (আ.) হজরত ইসমাইল (আ.)-কে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানির জন্য স্বপ্নে আদেশ পান। তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা হজরত ইসমাইল (আ.)-কে বলে তাঁর অভিমত জানতে চান। উত্তরে হজরত ইসমাইল (আ.) বলেন, পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা পালন করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। অতঃপর তিনি হজরত ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করার জন্য মিনা নামক স্থানে নিয়ে মাটিতে শুইয়ে দেন। এমন সময় মহান আল্লাহ হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে ইবরাহিম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করে দেখালে। এরপর মহান আল্লাহ হজরত ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি হালাল পশু পাঠিয়ে তা কুরবানি করার ব্যবস্থা করেন। তখন থেকেই মুসলমানগণ প্রতিবছর হালাল পশু কুরবানি করে থাকে।

কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিধি-বিধান রয়েছে। ঈদুল আযহার দিন এবং এর পরের দুই দিন অর্থাৎ ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কুরবানি করতে হয়। তবে প্রথম দিন কুরবানি করা উত্তম। কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণির কিছু পশু রয়েছে। এগুলো হলো নির্দিষ্ট বয়সের উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং দুম্বা। কুরবানির পশু সুস্থ ও নিখুঁত হতে হবে। কুরবানির সময় সঠিক নিয়ত করা জরুরি। সঠিক নিয়মে পশু জবাই করতে হবে। জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নত। কুরবানির গোশত তিন ভাগে ভাগ করা উত্তম। এক ভাগ কুরবানি দাতার পরিবারের জন্য, একভাগ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য, আর এক ভাগ ফকির ও মিসকিনদের জন্য। একটি গরু, মহিষ, উট সর্বোচ্চ সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানি করা যায়। অপরদিকে একটি ছাগল, ভেড়া, দুম্বা একজনের পক্ষ থেকে কুরবানি করতে হয়।

ইসলামে কুরবানির গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। এর ধর্মীয়, সামাজিক ও আর্থিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। কুরবানির কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা হলো–

১। মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন: কুরবানি আমাদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে শেখায়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের সব কাজ করা উচিত।

২। আত্মার পরিশুদ্ধি: কুরবানির মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করতে শিখি। এতে করে আমাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। লোভ ও অহংকার দূর হয়।

৩। ত্যাগের মানসিকতা: কুরবানির মাধ্যমে আমরা শিখি কীভাবে নিজের প্রিয় বস্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করা যায়। এই মানসিকতা আমাদেরকে স্বার্থপরতার পরিবর্তে বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে শেখায়।

৪। সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ: কুরবানির গোশত গরিব ও দুঃস্থদের মধ্যে বণ্টন করতে হয়। এর মাধ্যমে সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এটি আমাদের মধ্যে উদারতা ও সহানুভূতির অনুভূতি জাগ্রত করে।

কুরবানির আরও অনেক গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। ইসলামে তাই কুরবানির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরবানি দ্বারা মহান আল্লাহ মূলত মানুষের তাকওয়া পরীক্ষা করেন। মহান আল্লাহর কাছে কুরবানির পশুর রক্ত, মাংস, চামড়া কিছুই পৌঁছায় না, শুধু পৌঁছায় অন্তরের তাকওয়া ও নিষ্ঠা। মানুষের লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে মানবীয় গুণাবলি উজ্জীবিত করতে পারলেই কুরবানি

সার্থক হয়। আমরা কুরবানির ত্যাগের শিক্ষা দ্বারা আলোকিত হয়ে নিজেদেরকে মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ রূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হব।

ক) বাস্তব জীবনে কুরবানির ত্যাগের শিক্ষা সম্পর্কে লিখি। কাজটি একাকী করি।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এই গ্রন্থ শুদ্ধভাবে পড়া ও বোঝা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ না করলে অর্থের পরিবর্তন হতে পারে। মহান আল্লাহ এতে আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। ফলে আমরা গুনাহগার হব। সালাতে পবিত্র কুরআনের অশুদ্ধ তিলাওয়াতের কারণে আমাদের সালাতও সহিহ হবে না। তাই আমরা তাজবিদ অধ্যয়নের মাধ্যমে সহিহ তিলাওয়াতের নিয়মাবলি সম্পর্কে জানব। সর্বদা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় সেগুলো অনুশীলন করতে সচেষ্ট হব।

কুরআন তিলাওয়াতে অনেক সাওয়াব রয়েছে। সুতরাং বিশুদ্ধভাবে কুরআন শেখা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। তাজবিদ শেখার মাধ্যমে আমরা বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানতে পারি।

তাজবিদ

তাজবিদ (تَجْوِيْدٌ) আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ 'সুন্দর করা'। অর্থাৎ কুরআনের বর্ণগুলো সঠিকভাবে সুন্দর করে পাঠ করা। তাজবিদ হলো পবিত্র কুরআন সহিহ বা শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করার পদ্ধতি। তাজবিদের বিভিন্ন বিষয়বস্তু রয়েছে। যেমন–মাখরাজ, গুন্নাহ, ইখফা, ইদগাম, ইজহার ইত্যাদি। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা উদাহরণসহ এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারব।

তাজবিদের নিয়ম অনুযায়ী কুরআন পড়া আবশ্যক। পবিত্র কুরআনকে ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করার জন্য মহান আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

উচ্চারণ: ওয়া রাত্তিলিল কুরআনা তারতীলা।

অর্থ: কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে। (সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ৪)

মহানবি (স.) সুরেলা কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেছেন– "তোমরা কুরআনকে তোমাদের সুর দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)

তাজবিদ অনুসারে কুরআন তিলাওয়াত না করলে কুরআনের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং আমরা তাজবিদের নিয়মাবলি অনুসারে সঠিকভাবে ও সুরেলা কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য সচেষ্ট হব।

ক) তাজবিদ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

মাখরাজ

মাখরাজ (اَلْمَخْرَجُ) আরবি শব্দ, যার অর্থ 'উচ্চারণের স্থান'। প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালার একটি নির্দিষ্ট উচ্চারণরীতি রয়েছে। আরবি হরফেরও উচ্চারণরীতি রয়েছে। আরবি হরফের উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। একেকটি হরফ বা বর্ণ মুখের একেক জায়গা থেকে উচ্চারিত হয়। কখনো জিহ্বা, কখনো তালু, কখনো দাঁত, কখনো ঠোঁট, কখনো কণ্ঠনালি ইত্যাদি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। আবার কখনো একাধিক অংশের সমন্বয়ে উচ্চারিত হয়। একটি হরফ মুখের যে স্থান থেকে উচ্চারিত হয় সে স্থানকে সে হরফের মাখরাজ বলে।

আরবি ২৯টি হরফ সর্বমোট ১৭টি মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়। এ ১৭টি মাখরাজ মুখের ৫টি স্থানে অবস্থিত। যথা– ১. মুখের খালি জায়গা (জাওফ), ২. কণ্ঠনালি (হলক্ব), ৩. জিহ্বা, ৪. উভয় ঠোঁট ও ৫. নাসিকামূল।

আরবি ২৯টি হরফ যে যে মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় সেগুলো হলো–

১নং মাখরাজ: কণ্ঠনালির (হলক্ব) শুরু থেকে উচ্চারিত হয়– হামজা (ء) , হা (ه);

২নং মাখরাজ: কণ্ঠনালির (হলক্ব) মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হয়– আইন (ع), হা (ح);

৩নং মাখরাজ: কণ্ঠনালির (হলক্ব) শেষভাগ থেকে উচ্চারিত হয়– গাইন (غ), খা (خ);

৪নং মাখরাজ: জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে পড়তে হয়– ক্বাফ (ق);

৫নং মাখরাজ: জিহ্বার গোড়া থেকে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে পড়তে হয়– কাফ (ك);

৬নং মাখরাজ: জিহ্বার মধ্যভাগ থেকে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে পড়তে হয়– জিম (ج), শিন (ش), ইয়া (ى);

৭নং মাখরাজ: জিহ্বার গোড়ার কিনারা সামনের উপরের একপাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে পড়তে হয়– দোয়াদ (ض);

৮নং মাখরাজ: জিহ্বার অগ্রভাগের কিনারা সামনের উপরের একপাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে পড়তে হয়– লাম (ل);

৯নং মাখরাজ: জিহ্বার অগ্রভাগ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে পড়তে হয়– নুন (ن);

১০নং মাখরাজ: জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে পড়তে হয়– রা (ر);

১১নং মাখরাজ: জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে পড়তে হয়– তা (ت), দাল (د), ত্ব (ط);

১২নং মাখরাজ: জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের নিচের দুই দাঁতের শেষভাগে লাগিয়ে পড়তে হয়– ঝা (ز), সিন (س), সোয়াদ (ص);

১৩নং মাখরাজ: জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের উপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগের সঙ্গে লাগিয়ে পড়তে হয়– ছা (ث), যাল (ذ), যোয়া (ظ);

১৪নং মাখরাজ: নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগের সঙ্গে লাগিয়ে পড়তে হয়– ফা (ف);

১৫নং মাখরাজ: দুই ঠোঁট হতে পড়তে হয়– বা (ب), মিম (م), ওয়াও (و);

[বা (ب) উভয় ঠোঁটের ভিজা স্থান থেকে এবং মিম (م) উভয় ঠোঁটের শুকনো স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। ওয়াও (و) এর উচ্চারণের সময় দুই ঠোঁট গোল হয়ে মধ্যখানে সামান্য ছিদ্র থাকবে।]

১৬নং মাখরাজ: মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দ এর হরফ– আলিফ (ا), ওয়াও (و), ইয়া (ي);

১৭নং মাখরাজ: নাকের মাধ্যমে গুন্নাহ করে উচ্চারিত হয়– ইন্না (اِنَّ), ছুম্মা (ثُمَّ), আন্না (اَنَّ)।

প্রতিটি আরবি বর্ণের মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থান সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আরবি বর্ণগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করে আমরা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি। নামাজসহ অন্যান্য ইবাদতও সঠিকভাবে আদায় করতে পারি। আরবিতে শুদ্ধভাবে কথা বলা ও বক্তৃতা দেওয়ার জন্যও মাখরাজ জানা গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা মাখরাজ সম্পর্কে জেনে কুরআন তিলাওয়াতে তা অনুশীলন করতে সচেষ্ট হব।

ক) মাখরাজ বা উচ্চারণের স্থানের যেকোনো পাঁচটির নাম লিখে একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

গুন্নাহ

পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের জন্য গুন্নাহ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এটি তাজবিদের একটি গুরত্বপূর্ণ নিয়ম। এই নিয়মে নির্দিষ্ট কিছু আরবি বর্ণ নাকের মাধ্যমে উচ্চারণ করা হয়। গুন্নাহ (اَلْغُنَّةُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ নাক ব্যবহার করে উচ্চারিত ধ্বনি। নাকের মূল হতে নির্গত আওয়াজকে গুন্নাহ বলা হয়। অনেকটা বাংলা ভাষার চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণের মতো গুন্নাহর উচ্চারণ হয়। আল-কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে গুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম। গুন্নাহ মেনে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করলে শ্রুতিমধুর ও শুদ্ধ ধ্বনির সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআনের বাণীকে মনোমুগ্ধকর করে তোলে। আমরা তিলাওয়াতের সময় যথাস্থানে গুন্নাহ করে মহান আল্লাহর বাণীকে শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে সচেষ্ট হব।

আমরা পূর্বে জেনেছি যে, আরবি হরফ সর্বমোট ২৯টি। এর মধ্যে মিম (م) ও নুন (ن) গুন্নাহর হরফ। এই হরফ দুটি যখন তাশদিদযুক্ত হয়, তখন তাদেরকে নাকের মধ্যে নিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। গুন্নাহর সময় এক আলিফ পরিমাণ সময় নিয়ে মিম (م) ও নুন (ن)-এর গুন্নাহ নাকের মাধ্যমে উচ্চারণ করতে হয়।

গুন্নাহর প্রকারভেদ

গুন্নাহ তিন প্রকার। যথা–

১. ওয়াজিব গুন্নাহ

২. মিম সাকিন গুন্নাহ

৩. নুন সাকিন গুন্নাহ বা তানবিন গুন্নাহ

১. ওয়াজিব গুন্নাহ

ওয়াজিব গুন্নাহ হলো নুন বা মিমের উপর তাশদিদ থাকলে গুন্নাহ করে পড়া। যেমন– اَنَّ, هُمَّ

২. মিম সাকিন গুন্নাহ

মিম সাকিন গুন্নাহ হলো মিম সাকিনের পরে ب (বা) থাকলে অথবা م (মিম) থাকলে গুন্নাহ করে পড়া। যেমন– رَبَّهُمْ بِهِمْ (রাব্বাহুম্ বিহিম্)।

৩. নুন সাকিন গুন্নাহ বা তানবিন গুন্নাহ

নুন সাকিন বা তানবিনের পর যখন ইখফার ১৫টি হরফ আসে, তখন গুন্নাহ করে পড়া।

মিম সাকিনের বিধান

মিম সাকিনের বিধান তিনটি। যেমন–

ক) ইখফা (إِخْفَاءُ): মিম সাকিনের পরে ب (বা) হরফ থাকলে গুন্নাহসহ ইখফা করে পড়তে হয়। যেমন–

وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

খ) ইদগাম (إِدْغَامْ): মিম সাকিনের পরে م (মিম) হরফ এলে ইদগাম গুন্নাহসহ মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন–

فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ

গ) ইজহার (إِظْهَار): মিম সাকিনের পর ب (বা) ও م (মিম) ছাড়া অন্য যেকোনো হরফ থাকলে ইখফা ও গুন্নাহ ছাড়া ইযহার বা স্পষ্ট করে পড়তে হয়। যেমন–

أَلَمْ نَشْرَحْ	لَمْ يَكُنْ

নুন সাকিন ও তানবিনের বিধান

নুন সাকিন ও তানবিনের বিধান চার প্রকার। যেমন–
ক) ইকলাব
খ) ইদগাম
গ) ইযহার
ঘ) ইখফা
পরবর্তী পাঠে আমরা নুন সাকিন ও তানবিনের বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

ক) গুন্নাহর দুটি হরফসহ গুন্নাহর ব্যবহার রয়েছে এমন ৫টি শব্দের চার্ট তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

ইকলাব

ইকলাব আরবি শব্দ। এর অর্থ 'পরিবর্তন করা'। ইকলাবের হরফ হলো ب (বা)। নুন সাকিন কিংবা তানবিনের পর এই হরফ আসলে নুন সাকিন বা তানবিনকে م (মিম) দ্বারা পরিবর্তন করে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়াকে ইকলাব বলে। যেমন– سَمِيعٌ بَصِيرٌ (সামিউম্ বাছির)।

ইদগাম

ইদগাম (اِدْغَامٌ) আরবি শব্দ। এর অর্থ 'মিলিয়ে পড়া'। নুন সাকিন বা তানবিনের পর ইদগামের ছয়টি হরফ (ي — ر — م — ل — و — ن) থেকে কোনো একটি হরফ থাকলে নুন সাকিন বা তানবিনের সঙ্গে ঐ হরফকে সন্ধি করে মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বলা হয়। ইদগামের ফলে নুন সাকিন বা তানবিনের পরবর্তী হরফটি তাশদিদ (ّ) যুক্ত হয়। যেমন–

مِنْ مِّثْلِهٖ (মিম মিসলিহি)। এখানে ن (নুন) হরফটি পরবর্তী م (মিম) এর সঙ্গে ইদগাম হয়েছে।

মনে রাখার সুবিধার্থে ইদগামের ৬টি হরফকে একসঙ্গে يَرْمَلُوْنَ (ইয়ারমালুন) পড়া হয়।

ইদগামের প্রকারভেদ

ইদগাম দুই প্রকার। যেমন–

(১) ইদগামে বা-গুন্নাহ (গুন্নাহসহ)
(২) ইদগামে বেলা-গুন্নাহ (গুন্নাহ ছাড়া)

ইদগামে বা-গুন্নাহ -এর হরফ ৪টি। যথা– ي — م — و — ن
ইদগামে বেলা-গুন্নাহ -এর হরফ ২টি। যথা– ر — ل

১. **ইদগামে বা-গুন্নাহ:** ইদগামে বা-গুন্নাহ হলো গুন্নাহসহ মিলিয়ে পড়া। নুন সাকিন অথবা তানবিনের পরে ن — و — م — ي এর যেকোনো হরফ আসলে তাশদিদ দিয়ে গুন্নাহসহ মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন– مَنْ يَّشَاءُ (মাই-ইয়া-শা----উ)।

২. **ইদগামে বেলা-গুন্নাহ:** ইদগামে বেলা-গুন্নাহ হলো গুন্নাহ ছাড়া পড়া। নুন সাকিন অথবা তানবিনের পরে ل ও ر এর যেকোনো একটি হরফ আসলে তাশদীদ দিয়ে গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন– مِنْ رَّبِّكَ (মির্ রাব্বিকা)।

ক) ইদগাম সংবলিত ৫টি শব্দের চার্ট তৈরি করে অনুশীলন করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

ইযহার

ইযহার (اِظْهَارٌ) আরবি শব্দ। এর অর্থ 'স্পষ্ট করে পড়া'। পরিভাষায় নুন সাকিন ও তানবিন-এর পর যদি ইযহারের ৬টি হরফ (ء ه ح خ ع غ) -এর যেকোনো একটি হরফ থাকে তখন নুন সাকিন বা তানবিনকে গুন্নাহ ছাড়া নিজ মাখরাজ অনুসারে স্পষ্ট করে পড়াকে ইযহার বলে। যেমন– عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (আলিমুন্ হাকিম)

নুন সাকিনের পরে ইযহারের হরফের উদাহরণ–

مِنْ خَيْرٍ	مِنْ خَوْفٍ	مِنْهُمْ	اَنْعَمْتَ

তানবিনের পরে ইযহারের হরফের উদাহরণ–

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ	عَذَابٌ اَلِيْمٌ	عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

ইযহারের নিয়ম যথাযথভাবে অনুশীলন করলে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত সুন্দর ও অর্থপূর্ণ হয়। কুরআনের সঠিক অর্থ বুঝতে পারা যায়। কুরআন তিলাওয়াতের সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কুরআন তিলাওয়াত সঠিকভাবে করার জন্য ইযহারের নিয়মগুলো জানা এবং তা অনুশীলন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই নিয়মগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করব।

ক) ইযহার সংবলিত ৫টি শব্দের একটি চার্ট তৈরি করে অনুশীলন করি। কাজটি জোড়ায় করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

ইখফা

ইখফা (اِخْفَاءٌ) আরবি শব্দ। এর অর্থ লুকিয়ে রাখা বা গোপন করা। ইখফার হরফ ১৫টি। যথা–

ك	ق	ف	ظ	ط	ض	ص	ش	س	ز	ذ	د	ج	ث	ت

নুন সাকিন বা তানবিনের পরে ইখফার যেকোনো হরফ আসলে নুন সাকিন বা তানবিনকে নাকের ভিতর লুকিয়ে গুন্নাহর সঙ্গে পড়তে হয়। যেমন– (اِنْ كُنْتُمْ) ইন-কুন-তুম্, (عِنْدَ) ইন-দা, (مِنْ شَرِّ) মিন-শাররি ইত্যাদি।

নুন সাকিনের ইখফার উদাহরণ–

مُنْذِرِيْنَ	مِنْ تَحْتِهَا	مِنْ سِجِّيْلٍ	مِنْكُمْ

তানবিনের ইখফার উদাহরণ–

نِعْمَةٍ تُجْزٰى	ذَرَّةٍ شَرًّا	ظِلًّا ظَلِيْلًا

ক) নুন সাকিন ও তানবিনের ইখফার ৩টি করে শব্দের চার্ট তৈরি করে অনুশীলন করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

নুন সাকিনের ইখফা	তানবিনের ইখফা
১.	
২.	
৩.	

সূরা আল-কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল-কাওসার	উচ্চারণ	অর্থ
اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ	১. ইন্না আ'ত্বাইনা কাল-কাওছার।	১. নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি।
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ	২. ফাসাল্লি লি রাব্বিকা ওয়ানহার।	২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কুরবানি করো।
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ	৩. ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার।	৩. নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই নির্বংশ।

সূরা আল-কাওসারের তাৎপর্য:

সূরা আল-কাওসার পবিত্র কুরআনের ১০৮তম সূরা, যা ৩০তম পারায় অবস্থিত। এই সূরার রুকুর সংখ্যা ১টি এবং আয়াত সংখ্যা ৩টি। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আল-কাওসার অর্থ 'অফুরন্ত কল্যাণ'। এ সূরাকে সূরা নাহারও বলা হয়।

সূরা আল-কাওসার নাজিল হওয়ার সময় সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর মুখমণ্ডলে হাসির ঝলক দেখতে পান। সূরা কাওসার হচ্ছে ইহকাল ও পরকালের অফুরন্ত কল্যাণের সুখবর। এই সূরা হতে 'হাউজে কাওসার' সম্পর্কে জানা যায়, যা কিয়ামতের দিনে মহানবি (স.)-কে প্রদান করা হবে।

ক) সঠিক উচ্চারণে সূরা আল-কাওসার শিক্ষকের সঙ্গে অডিয়ো শুনে/ভিডিয়ো দেখে তিলাওয়াত করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

অনুশীলনী - ১

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও:

(ক) সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা থেকে আমরা কী বুঝতে পারি?
১. আল্লাহর একত্ববাদ
২. সৃষ্টিজগতের পরিচয়
৩. নিয়ম ও শৃঙ্খলা
৪. সৃষ্টির রহস্য

(খ) তাওহিদ বলতে কী বোঝায়?
১. ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস
২. আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস
৩. রাসুল (স.)-এর ওপর বিশ্বাস
৪. পরকালে বিশ্বাস

(গ) মহান আল্লাহর গুণাবলিতে কাউকে অংশীদার করাকে কী বলা হয়?
১. কুফর
২. ফিসক
৩. শিরক
৪. দুশমন

(ঘ) কোনটি হজের ফরজ?
১. কুরবানি করা
২. ইহরাম বাঁধা
৩. মাথা কামানো
৪. সাঈ করা

(ঙ) সালাতে কখন তাশাহহুদ পড়তে হয়?
১. দ্বিতীয় ও শেষ রাকাতে
২. প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে
৩. তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে
৪. প্রত্যেক রাকাতে

(চ) দু'আ কুনুত আমাদের কী শেখায়?
১. ভদ্রতা ও নম্রতা
২. বিনয় ও আনুগত্য
৩. সহযোগিতা ও সহমর্মিতা
৪. আন্তরিকতা ও দয়া

(ছ) সালাতের ওয়াজিব কয়টি?
১. ১২টি
২. ১৩টি
৩. ১৪টি
৪. ১৫টি

(জ) কোন কাজ করলে রোজা ভেঙ্গে যায়?
১. এতেকাফ করলে
২. নিয়ত করলে
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে
৪. মানত করলে

(ঝ) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য আমরা কোন ইবাদত করব?

১. সালাত আদায় ২. সাওম পালন
৩. হজ পালন ৪. জাকাত আদায়

(ঞ) হামজা (ء) বর্ণটি কোন স্থান থেকে উচ্চারণ করতে হয়?

১. জিহ্বার অগ্রভাগ থেকে ২. জিহ্বার মধ্যভাগ থেকে
৩. কণ্ঠনালির শুরু থেকে ৪. কণ্ঠনালির শেষভাগ থেকে

২. শূণ্যস্থান পূরণ

ক) এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর আদেশেই সৃষ্টিজগৎ ---------- চলে।
খ) সালাতের ফরজ কাজগুলোকে ---------- ও আরকান বলে।
গ) জাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের ---------- সহায়তা প্রদান করা হয়।
ঘ) সাওম পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো ---------- অর্জন করা।
ঙ) কণ্ঠনালির ---------- থেকে আইন (ع) উচ্চারণ করতে হয়।

৩. বাম পাশের সাথে ডান পাশ মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. কাউকে আল্লাহর সাথে	মহান আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করেন।
খ. তাশাহহুদ পাঠ করার মাধ্যমে সালাত আদায়কারী	জীবনে একবার হজ করা ফরজ।
গ. প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ ও সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর প্রতি	উচ্চারণরীতি রয়েছে।
ঘ. প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালার একটি নির্দিষ্ট	গুন্নাহ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।
ঙ. পবিত্র কুরআন বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের জন্য	গুন্নাহ করে পড়তে হয়
	সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলে।

৪. শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়

ক) সালাতে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
খ) মুনাজাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করা যায়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
গ) বিশুদ্ধভাবে কুরআন শেখা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
ঘ) জাকাত আদায়ের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ হয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
ঙ) হজ অর্থের শুদ্ধিকরণ শেখায়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
চ) হরফের উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) আমরা সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা দেখে মহান আল্লাহ সম্পর্কে কী জানতে পারি?
খ) শিরক বলতে কী বোঝায়?
গ) পাঁচটি ইবাদতের নাম লেখো।
ঘ) তাজবিদ কেন শিখতে হয়?
ঙ) হজের দুইটি ফরজের নাম লেখো।
চ) আরবি ২৯টি হরফ কয়টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়?
ছ) কোন স্থান থেকে ক্বাফ উচ্চারণ করতে হয়?

৬. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) একই নিয়মে চলে এরূপ পাঁচটি সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা করো।
খ) একত্ববাদের ব্যাখ্যা দাও।
গ) সাওম -এর তাৎপর্য বর্ণনা করো।
ঘ) জাকাতের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।
ঙ) হজ সম্পর্কে আলোচনা করো।
চ) বাস্তব জীবনে কুরবানির ত্যাগের শিক্ষা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।
ছ) গুন্নাহর প্রকারভেদের একটি তালিকা তৈরি করো।
জ) কুরবানির ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমার করণীয় সম্পর্কে লেখো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবি, রাসুল ও মহানবি (স.)-এর সাহাবিগণের জীবনচরিত

হজরত দাউদ (আ.)

হজরত দাউদ (আ.) ফিলিস্তিনের বেথেলহেমে বনি ইসরাইল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মেষ চরাতেন। তখন থেকেই তিনি সাহসী ও বিচক্ষণ ছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেধা ও সাহসিকতার সুনাম সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর অসীম সাহসিকতার কারণে বাদশাহ তালুতের সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ পান। তাঁর যুদ্ধ কৌশল ছিল অসাধারণ। তিনি সেনাপতি থাকাকালে অত্যাচারী শাসক জালুতকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে বাদশাহ তালুত তাঁর কন্যাকে হজরত দাউদ (আ.)-এর সঙ্গে বিবাহ দেন। বাদশাহ তালুতের মৃত্যুর পর তিনি বনি ইসরাইলদের বাদশাহ নিযুক্ত হন।

হজরত দাউদ (আ.) ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তাঁর শাসনামলে রাজ্যের অনেক উন্নতি হয়েছিল। সঠিক বিচারব্যবস্থা কায়েমের জন্য তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ লোকদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন। আল্লাহভীরু ও আমানতদার লোকদের কোষাগারের রক্ষক নিয়োগ করেন।

হজরত দাউদ (আ.) ইসলামের একজন নবি ও রাসুল ছিলেন। তাঁর ওপর আসমানি কিতাব 'যাবুর' নাযিল হয়। মহান আল্লাহ বলেন–

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

উচ্চারণ: ওয়া আতাইনা দাউদা যাবুরা।

অর্থ: আমি দাউদকে যাবুর (আসমানি কিতাব) দিয়েছি। (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত: ৫৫)

তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর। তিনি যাবুর কিতাব তিলাওয়াত করতেন। তাঁর সুমধুর তিলাওয়াত শুনতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী চারপাশে ভিড় করত। তিনি পশুপাখির ভাষা বুঝতে পারতেন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। রাতে খুব কম ঘুমাতেন। প্রায় সারারাত ইবাদত করতেন। এছাড়া তিনি এক দিন পর পর রোজা রাখতেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হজরত সুলায়মান (আ.)। হজরত দাউদ (আ.)-এর পরে তিনি বাদশাহ এবং নবি হন।

জীবনাদর্শ

হজরত দাউদ (আ.) অসংখ্য গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তাঁর মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নম্রতা, তাকওয়া, ধার্মিকতা ও মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। অসংখ্য পরীক্ষা ও সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে অটল ছিলেন। তিনি রাজকোষ থেকে কোনো সম্মানি গ্রহণ করতেন না। নিজ হাতে ইস্পাতের বর্ম তৈরি করতেন। আর তা বিক্রির আয় দিয়ে নিজের সংসার চালাতেন।

মহানবি (স.) হজরত দাউদ (আ.)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন- "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবি দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।" (সহিহ বুখারি)

হজরত দাউদ (আ.) ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি। জনগণের অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য তিনি ছদ্মবেশে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। জনগণের অভাব-অভিযোগ শুনে তা সমাধানের চেষ্টা করতেন। তিনি মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সব সময় জনগণের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতেন। এই গুণ তাঁকে মানুষের কাছে অনেক প্রিয় করে তুলেছিল। এজন্য তিনি জনগণের কাছ থেকে অনেক সম্মান ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তিনি খুবই বিনয়ী ও নিরহংকারী ছিলেন। সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। তাঁর প্রতিটি অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করতেন।

জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমরা হজরত দাউদ (আ.)-এর আদর্শ ও গুণাবলি অনুসরণ করতে পারি। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা মহান আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে পারি। সঠিকভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে পারি। সকল কাজে আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে পারি। আমাদের বিভিন্ন অর্জনের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিদের সঙ্গে কথা, কাজ ও আচরণে সর্বদা সৎ থাকতে পারি। নিজের কাজ নিজে করতে পারি। অন্যদের সঙ্গে আচরণে বিনয়ী ও নিরহংকারী হতে পারি। এভাবে হজরত দাউদ (আ.)-এর মহৎ গুণাবলি অনুসরণের মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারি।

ক) হজরত দাউদ (আ.)-এর জীবনাচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি। কাজটি জোড়ায় করি।

খ) হজরত দাউদ (আ.)-এর জীবনাচরণ অনুসরণ করে আমরা নিজেরা যে কাজগুলো করব, তার একটি তালিকা তৈরি করি। দলগতভাবে আলোচনা করে কাজটি করি।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

হজরত ঈসা (আ.)

হজরত ঈসা (আ.) একজন নবি ও রাসুল ছিলেন। তাঁর ওপর আসমানি কিতাব 'ইনজিল' নাযিল হয়। তিনি প্রায় দুই হাজার বছর আগে বর্তমান ফিলিস্তিনের বেথেলহেমে 'বনি ইসরাইল' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল হজরত মারিয়াম (আ.)। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী ও দয়ালু।

চিত্র: প্রাচীন বেথেলহেম

হজরত ঈসা (আ.) তাঁর গোত্রের মানুষের মধ্যে এক আল্লাহর আনুগত্য, দয়া, ভালোবাসা ও শান্তির বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাগুলো মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তবে এসব কাজ করতে গিয়ে তিনি তখনকার ইহুদি ধর্মীয় নেতাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর লক্ষ্যে অটল ছিলেন। তিনি যাতে তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন সেজন্য মহান আল্লাহ তাঁকে 'মুজিযা' (অলৌকিক ক্ষমতা) দান করেন। যেমন– শ্বেতী ও কুষ্ঠ রোগীদের সুস্থ করা, মৃতদের জীবিত করা, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করা, সামান্য খাবার দিয়ে অনেককে খাওয়ানো ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি দোলনায় থাকা অবস্থায়ই কথা বলতে পারতেন।

হজরত ঈসা (আ.)-এর সময়ে তাঁর গোত্রের লোকেরা মহান আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। হজরত ঈসা (আ.) তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানান। সকল পাপাচার ও অন্যায় কাজ পরিহার করতে উপদেশ দেন; কিন্তু লোকেরা তাঁর উপদেশ গ্রহণ করল না। তারা তাঁর সঙ্গে দুশমনি করতে লাগল। এমনকি তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। একদিন তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য লোক পাঠাল; কিন্তু হজরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে ব্যর্থ হলো। তখন মহান আল্লাহ তার অসীম কুদরতে হজরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি ৪০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন এবং আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মত হিসেবে দ্বীন প্রচার করবেন। অতঃপর তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করবেন এবং তাঁকে মহানবি (স.)-এর রওজা মুবারকের পাশে দাফন করা হবে।

জীবনাদর্শ

হজরত ঈসা (আ.) অসংখ্য গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। মহান আল্লাহর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রতি দয়া, ভালোবাসা, সেবা ও নম্রতা প্রদর্শনের জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত ও দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি অসুস্থদের সুস্থ করেছেন। একবার তিনি একজন কুষ্ঠরোগীর দেখা পান। তার কষ্ট ও দুর্দশা দেখে তিনি তাকে স্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কুষ্ঠরোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। অন্যের সেবা করার জন্য তিনি কোনো বিনিময়, প্রশংসা বা স্বীকৃতি চাইতেন না।

তিনি ছিলেন নম্র, বিনয়ী, দয়ালু ও ক্ষমাশীল। পাপীদের প্রতি করুণা ছিল তাঁর, পাপের প্রতি ছিল ঘৃণা। যারা অপরাধ করে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হত, তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন। তিনি মানুষের সেবা করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে এ গুণ চর্চা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

হজরত ঈসা (আ.)-এর জীবনাচরণ ও শিক্ষা আমাদের জন্য অনুসরণীয়। মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আনুগত্যসহ অন্যান্য মহৎ গুণাবলি আমরা অনুশীলন করতে পারি। সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারি। তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতে পারি। অসুস্থ রোগীদের সেবা করতে পারি। পৃথিবীর সকল মানুষকে একনিষ্ঠভাবে ভালোবাসতে পারি। অপরাধী অনুতপ্ত হলে তাকে ক্ষমা করতে পারি। প্রতিবেশীদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারি। সকল অবস্থায় সকল মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করতে পারি।

ক) হজরত ঈসা (আ.)-এর জীবনাচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি। কাজটি জোড়ায় করি।

খ) হজরত ঈসা (আ.)-এর জীবনাচরণ অনুসরণ করে আমরা নিজেরা যে কাজগুলো করব তার একটি তালিকা তৈরি করি। দলে আলোচনা করে কাজটি করি।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি। তিনি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীর কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। শৈশবেই তিনি পিতা-মাতাকে হারিয়ে দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হন। তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার জন্য বাল্যকালেই তিনি সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। এজন্য সবাই তাঁকে 'আল-আমিন' (বিশ্বস্ত) নামে অভিহিত করত। বর্তমানে তাঁর দেখানো পথে কোটি কোটি মানুষ ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করছেন। পূর্বশ্রেণিতে আমরা মহানবি (স.)-এর জন্ম থেকে কৈশোরকাল পর্যন্ত জেনেছি। বর্তমান পাঠে আমরা তাঁর যৌবনকাল থেকে শেষজীবন পর্যন্ত জানব।

যৌবনকাল

মহানবি (স.) যুবক বয়স থেকেই আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে ভাবতেন। সেই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে। পবিত্র কাবাঘর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কুরাইশরা সকলে মিলে কাবাঘর সংস্কার শুরু করলেন; কিন্তু 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর স্থাপন করাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। প্রত্যেক গোত্রই এই পাথর কাবার দেয়ালে স্থাপনের সুযোগ ও সম্মান পেতে চাইল। এ নিয়ে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এমতাবস্থায় 'উমাইয়া বিন মুগিরা' নামক একজন প্রবীণ ব্যক্তি একটি প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটি ছিল পরদিন ভোরে সবার আগে কাবাঘরে প্রবেশকারী ব্যক্তিই বিবাদ মীমাংসা করবে। পরদিন ভোরে সবার আগে হজরত মুহাম্মদ (স.) কাবাঘরে প্রবেশ করলেন। সবাই আনন্দিত হয়ে তার ওপরেই মীমাংসার দায়িত্ব দিলেন। তিনি একখানা চাদর বিছিয়ে তার উপর নিজ হাতে পাথরখানা রাখলেন। তারপর গোত্র প্রধানগণকে চাদরের চতুর্দিক ধরে পাথরটিকে যথাস্থানে বহন করে নিয়ে যেতে বললেন। সকলে চাদরসহ পাথরটি যথা স্থানে নিয়ে গেল। এরপর মহানবি (স.) নিজ হাতে পাথরটি কাবার দেয়ালে বসিয়ে দিলেন। পাথর স্থাপনের সম্মান পেয়ে সবাই খুশি হলো। এভাবে একটি অনিবার্য যুদ্ধ থেকে সবাই বেঁচে গেল।

তখনকার দিনে আরবে একজন বিদুষী ও ধনী নারী বাস করতেন। তাঁর নাম খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ। তিনি তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনা করার জন্য একজন বিশ্বস্ত মানুষ খুঁজছিলেন। হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জেনে তিনি তাঁর ওপর নিজ ব্যবসায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। মহানবি (স.) এ দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান এবং ব্যবসায় অনেক লাভ করে মক্কায় ফিরে আসেন। হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সততা, বিশ্বস্ততা, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে হজরত খাদিজা (রা.) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। চাচা আবু তালিবের মধ্যস্থতায় তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের সময় হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং হজরত খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর।

যৌবনকালের আদর্শসমূহ

হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বোত্তম নৈতিক গুণাবলি ও মূল্যবোধের প্রতীক। তাঁর চরিত্রে ক্ষমা, উদারতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, দয়া, মানবতা ও মহত্ত্ব ইত্যাদি গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। স্বয়ং মহান আল্লাহ হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ অনুসরণের জন্য পবিত্র কুরআনে বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

উচ্চারণ: লাক্বাদ কা-না লাকুম ফী রাসুলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ

অর্থ: আল্লাহর রাসুলের জীবনাচরণে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)

হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ। তাঁর জীবনাদর্শ ও শিক্ষা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষকে উত্তম নৈতিক গুণাবলি অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে। নবুয়ত লাভের পূর্বেই তিনি তাঁর জ্ঞান, সুন্দর চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন। সমাজের নিপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য তাঁর গভীর মমতা ছিল। তিনি এতিম, বিধবা ও দরিদ্রদের প্রতি দয়াশীল ও উদার ছিলেন। একবার তিনি দেখলেন যে, একজন বয়স্ক মহিলা একটি ভারী বোঝা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। মহিলার খুব কষ্ট হচ্ছিল। হজরত মুহাম্মদ (স.) নিজে মহিলার বোঝা তার বাড়িতে পৌঁছে দেন।

নবুয়তপ্রাপ্তি

তরুণ বয়স থেকেই হজরত মুহাম্মদ (স.) মানুষের মুক্তি ও শান্তির জন্য ভাবতেন। তখন আরবের মানুষ মূর্তিপূজা, শিরক, ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিতে জর্জরিত ছিল। তিনি এসব বিষয় নিয়ে মক্কার কাছে জাবালে নূর পর্বতের হেরা গুহায় বসে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় হজরত জিবরাইল (আ.) আল্লাহর বাণী (ওহি) নিয়ে আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। তখন থেকে মহানবি (স.) ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত মহান আল্লাহর নিকট থেকে ওহি পেতে থাকেন। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয় পবিত্র কুরআন।

নবুয়ত লাভের পর মহানবি (স.) মক্কার মানুষদের ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানান। প্রথমদিকে তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তখন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী হজরত খাদিজা (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর পুরুষদের মধ্যে হজরত আবু বকর (রা.) এবং বালকদের মধ্যে হজরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

চিত্র: হেরা গুহা

মদিনায় হিজরত

মহানবি (স.) মহান আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করলে মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। তারা তাঁর অনুসারীদের ওপর নিপীড়ন শুরু করে। ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.) ও চাচা আবু তালিব ইন্তিকাল করেন। প্রিয়জন বিয়োগের শোক ও কাফিরদের অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি মক্কাবাসীদের ইসলামের পথে আহ্বান করতে থাকেন। এরপর ইসলাম প্রচার করতে তায়েফ যান। তায়েফবাসীরা তাঁর পবিত্র শরীর ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত করে। তিনি তাদের অভিশাপ না দিয়ে ক্ষমা করে দেন। মক্কা ও তায়েফবাসীর দুর্ব্যবহারে মহানবি (স.) অত্যন্ত মর্মাহত হন।

৬২১ খ্রিষ্টাব্দে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে মহানবি (স.) মিরাজ বা ঊর্ধ্বগমন করেন। রজব মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে তিনি মাসজিদুল হারাম (কাবা শরিফ) থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে যান। তাঁর এই সফরকে বলা হয় ইসরা বা রাত্রিকালীন ভ্রমণ। অতঃপর সেখান থেকে তিনি মিরাজে যান। তিনি সাত আসমান অতিক্রম করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন। এ সময় তিনি মহান আল্লাহর নিকট থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশনা পান। এ ঘটনার পর মহানবি (স.) নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।

যখন মক্কাবাসীদের বিরোধিতা ও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায় তখন মহানবি (স.) মহান আল্লাহর ইশারায় মক্কা থেকে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে তিনি মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার্থে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে নির্দেশ দেন। সেখানে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী মুসলমানদের আশ্রয় প্রদান করেন। এটিই ছিল মুসলমানদের প্রথম হিজরত। দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাই মক্কার কুরাইশরা হজরত মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতিতে মহানবি (স.) মদিনায় হিজরত করার জন্য মহান আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশনা পান। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। যাঁরা মহানবি (স.)-এর নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকে 'মুহাজির' (অভিবাসী) বলা হয়। হিজরতের পর মদিনাবাসীরা মহানবি (স.) ও তাঁর সাহাবিদের আশ্রয় দেন। যাঁরা আশ্রয় প্রদান করেছিলেন তাদেরকে 'আনসার' (সাহায্যকারী) বলা হয়। মদিনায় হিজরত ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পরবর্তী সময়ে হিজরতের বছরকে ভিত্তি করে হিজরি সাল গণনা শুরু হয়।

মদিনায় এসে রাসুল (স.) একটি কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রের জন্য একটি সনদ রচনা করেন, যা 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। সনদে সকল ধর্মমতের মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা হয়।

হিজরতের পরেও মহানবি (স.) ও তাঁর সাহাবিগণ বিরোধীদের বিভিন্ন হুমকি ও ষড়যন্ত্রের শিকার হতে থাকেন। এর ফলে জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হয় এবং শত্রুদের সঙ্গে অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এগুলোর মধ্যে বদর যুদ্ধ, উহুদ যুদ্ধ ও খন্দক যুদ্ধ অন্যতম। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে বা হিজরি ৬ষ্ঠ বর্ষে মহানবি (স.) ও তাঁর সাহাবিগণ উমরা পালন করতে মক্কায় যেতে চাইলে কুরাইশরা বাধা দেয়। শান্তির স্বার্থে তিনি তাদের সঙ্গে একটি সন্ধি বা চুক্তি করেন, যা 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। তারপর অগণিত লোক ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন; কিন্তু দুই বছরের মধ্যেই কুরাইশরা চুক্তি বাতিল করে। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ বা ৮ম হিজরির রমজান মাসে মহানবি (স.) ১০ হাজার সাহাবি নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন। এরপর তিনি মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে বা ১০ম হিজরিতে মহানবি (স.) লক্ষাধিক সাহাবি নিয়ে হজ আদায় করেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ। তাই একে 'বিদায় হজ' বলে। এ সময় তিনি আরাফা ময়দানে জাবালে রহমতে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। একে 'বিদায় হজের ভাষণ' বলে। এই ভাষণে তিনি ন্যায়বিচার, সুদপ্রথার বিলোপ, সাম্য, মুসলমানদের ঐক্য এবং কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। বিদায় হজের কিছুদিন পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে বা একাদশ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল ইন্তিকাল করেন।

আমরা আমাদের জীবনে মহানবি (স.)-এর আদর্শগুলো অনুসরণ করব। সর্বদা সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে

আমাদের দায়িত্ব পালন করব। অসহায়, অত্যাচারিত ও নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়াব। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মহান আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখব। সবসময় ধৈর্যের সঙ্গে ন্যায়ের লক্ষ্যে কাজ করে যাব। মদিনা সনদের আলোকে ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ সহনশীলতা প্রদর্শন করব। ভিন্ন ধর্মের সহপাঠীদের সঙ্গে সহনশীল আচরণ করব। এভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আমরা মহানবি (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ করব।

ক) হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর যৌবনকালের বিভিন্ন ঘটনা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করে একটি প্রবাহচিত্র তৈরি করি। কাজটি একাকী করি।

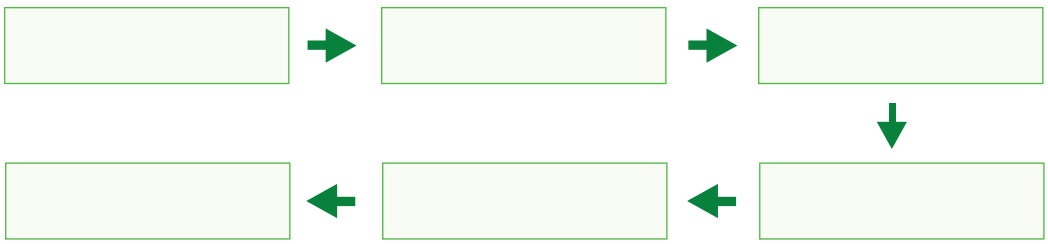

খ) হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর যৌবনকালের আদর্শ অনুসরণ করে আমরা নিজেরা যে কাজগুলো করব তার একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

গ) হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তি সম্পর্কে জোড়ায় আলোচনা করে সেসম্পর্কে নিজের ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।

ঘ) ছবি ও ভিডিয়োতে হিজরতের বিভিন্ন ঘটনা দেখে হিজরত সম্পর্কে আলোচনা করি এবং মহানবি (স.) প্রদত্ত শিক্ষা সম্পর্কে একটি পোস্টার তৈরি করি। কাজটি দলে করি।

হজরত উসমান (রা.)

হজরত উসমান (রা.) ৫৭৩ মতান্তরে ৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফফান এবং মাতার নাম আরওয়া। অল্প বয়স থেকেই তিনি দয়া, নম্রতা ও সততার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারী একজন সাহাবি। মহানবি (স.)-এর দুই কন্যার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি 'জুন্নুরাইন' বা 'দুই নূরের অধিকারী' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হজরত উসমান (রা.) ছিলেন বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত একজন মানুষ। অকাতরে দান, পরোপকারিতা ও উদারতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। মুসলিমদের সহায়তা এবং দুঃস্থ ও আর্ত-মানবতার সেবায় তিনি তাঁর সম্পদ দান করতেন। এজন্য তাঁকে 'গণি' উপাধি দেওয়া হয়। গণি শব্দের অর্থ ধনী।

জীবনাদর্শ

হজরত উসমান (রা.) ইসলাম ও জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ করেন। তিনি জনসাধারণের সুবিধার জন্য মসজিদ নির্মাণ ও পানির কূপ খনন করেন। দরিদ্র, এতিম ও বিধবাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। একবার মদিনায় তীব্র পানির সংকটের সময় জনগণ খুবই দুর্দশার সম্মুখীন হয়। তাদের একমাত্র পানির উৎস ছিল 'বির-ই-রুমাহ' নামক একটি কূপ। কূপটির মালিক কূপটি সবার জন্য উন্মুক্ত করতে রাজি ছিল না। কূপ থেকে পানি নেওয়ার জন্য সে অতিরিক্ত মূল্য দাবি করেছিল। ফলে অনেকের পক্ষে পানি নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। হজরত উসমান (রা.) জনগণের এই দুর্দশার কথা জানতে পারেন। তিনি কূপটি মালিকের কাছ থেকে ২০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে জনগণ পানির কষ্ট ও দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পায়।

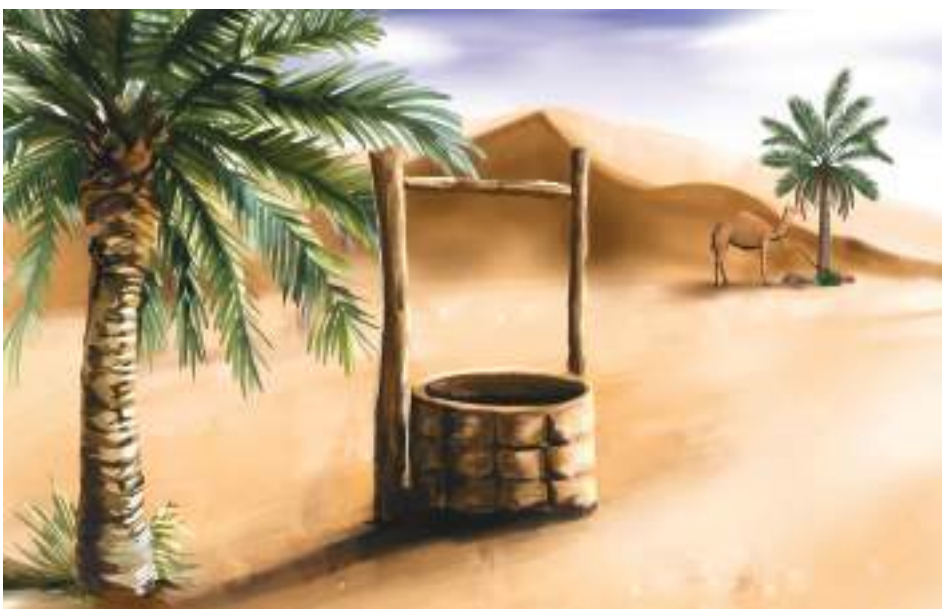

চিত্র: পানির কূপ

হজরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদিনের তৃতীয় খলিফা। দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর পরে তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্যে সমৃদ্ধি বিরাজ করেছিল। কারণ তিনি ন্যায়, দক্ষতা ও সহানুভূতির সঙ্গে শাসন কাজ পরিচালনা করেছিলেন। জনগণ তাঁকে একজন ন্যায়পরায়ণ ও পরোপকারী শাসক হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন।

ইসলামের জন্য হজরত উসমান (রা.)-এর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল কুরআন সংকলন। তাঁর খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্য অনেক বিস্তৃত হয়। তখন বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতে ভিন্নতা দেখা যায়। ফলে কুরআন তিলাওয়াতের অভিন্নতা রক্ষার জন্য হজরত উসমান (রা.) একটি প্রমিত সংস্করণ চালু করার উদ্যোগ নেন। তিনি সংকলন প্রক্রিয়ার যথার্থতা নিশ্চিত করতে বিজ্ঞ ও জ্ঞানী সাহাবিগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি হজরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক সংকলিত কুরআনের কপিকে ভিত্তি করে পাঠরীতির যাচাই-বাছাই শেষে একটি চূড়ান্ত সংকলন তৈরি করেন। সেই সংকলন অনুসরণ করেই পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনের সকল কপি তৈরি করা হয়। এজন্য তাঁকে 'জামিউল কুরআন' বা কুরআন সংকলনকারী বলে অভিহিত করা হয়। তিনি ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় শাহাদাতবরণ করেন।

চিত্র: পবিত্র কুরআন

হজরত উসমান (রা.) নম্র, বিনয়ী ও নিরহংকারী ছিলেন। তিনি ধনী-গরিব, অসহায় কিংবা ক্ষমতাবান সবার সঙ্গে সদয় ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি ছিলেন ন্যায় ও ধর্মপরায়ণতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর উদারতা, নম্রতা এবং ইসলামের প্রতি ভক্তি আমাদের জন্য অনুসরণীয়। আমরা তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনকল্যাণমূলক কাজে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারি। সবার সঙ্গে সহজ-সরল, সদয় ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে পারি। আমাদের কথা, কাজ ও আচরণে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ অবলম্বন করতে পারি।

ক) আমরা হজরত উসমান (রা.)-এর জীবনাচরণ সম্পর্কে জানলাম। এবার তাঁর জীবনাচরণের বিভিন্ন ঘটনা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করে একটি প্রবাহচিত্র তৈরি করি। কাজটি একাকী করি।

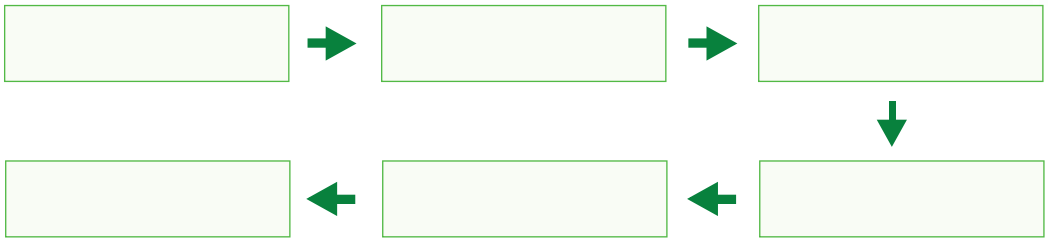

খ) হজরত উসমান (রা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আমরা নিজেরা যে কাজগুলো করব তার একটি পোস্টার তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

পোস্টার

হজরত আলী (রা.)

হজরত আলী (রা.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর চাচা আবু তালিবের পুত্র। তাঁর মাতা 'ফাতেমা বিনতে আসাদ' ছিলেন একজন ধার্মিক ও সম্মানিত নারী। শৈশবকাল থেকেই তিনি মহানবি (স.) এবং তাঁর স্ত্রী হজরত খাদিজা (রা.)-এর পরিবারে বেড়ে ওঠেন। তিনি মহানবি (স.)-এর শিক্ষা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। কিশোরদের মধ্যে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। তিনি ছিলেন মহানবি (স.)-এর প্রসিদ্ধ সাহাবিগণের একজন। ইসলামের সেবায় হজরত আলী (রা.) অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালান। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে বা ২য় হিজরিতে মহানবি (স.)-এর কন্যা হজরত ফাতেমা (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

জীবনাদর্শ

হজরত আলী (রা.) মহানবি (স.)-এর সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ ও খন্দকের যুদ্ধসহ ইসলামের প্রথম যুগের অনেকগুলো যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সাহস ও সামরিক দক্ষতার জন্য তিনি মহানবি (স.)-এর কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। বদর যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের জন্য মহানবি (স.) তাঁকে 'জুলফিকার' নামক তরবারি উপহার দেন। খাইবারের সুরক্ষিত কামুস দুর্গ জয় করলে মহানবি (স.) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর এই ভূমিকা মুসলিম রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে বা ৬ষ্ঠ হিজরিতে মদিনার মুসলমানদের এবং মক্কার কুরাইশ গোত্রের মধ্যে ১০ বছরের একটি চুক্তি হয়েছিল যা 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। এই চুক্তির ফলে মুসলমানরা মক্কায় হজ করার সুযোগ পান। এই চুক্তিপত্রের লেখক হিসেবে হজরত আলী (রা.) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

হজরত আলী (রা.) তাঁর পূর্ববর্তী তিন খলিফার উপদেষ্টা ও পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। খলিফা হিসেবে তিনি ন্যায়বিচার, সমতা এবং জনগণের কল্যাণের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি সামাজিক অবিচার দূর করার জন্য এবং অসহায় ও দুর্বলদের চাহিদা পূরণ করতে বেশ কয়েকটি সংস্কার শুরু করেছিলেন।

হজরত আলী (রা.) ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার একজন কঠোর অনুসারী ছিলেন। সিফফিন যুদ্ধে তাঁর ব্যবহৃত প্রিয় বর্মটি হারিয়ে যায়। একদিন তিনি কুফার বাজারে এক অমুসলিমকে বর্মটি বিক্রি করতে দেখে তাকে বর্মটি ফিরিয়ে দিতে বলেন। লোকটি তা দিতে রাজি হলো না। হজরত আলী (রা.) জোর করে তা নিয়ে নিতে পারতেন; কিন্তু তিনি সেটা করলেন না। তিনি আইন অনুযায়ী লোকটির বিরুদ্ধে কাজির আদালতে অভিযোগ করেন। কাজি হযরত আলী (রা.)-এর কাছে বর্মটি যে তার সে সম্পর্কে প্রমাণ চাইলেন। তিনি এমন কোনো প্রমাণ দেখাতে পারলেন না, যা কাজির বিচারে গ্রহণযোগ্য। ফলে কাজি অমুসলিম লোকটির পক্ষে রায় দিলেন। আলী (রা.) তা বিনাবাক্যে মেনে নেন। এই ঘটনা লোকটিকে খুবই বিস্মিত করল। পরে সে স্বীকার করল যে, বর্মটি তার নয়। সিফফিন যুদ্ধে যাওয়ার সময় হজরত আলী (রা.)-এর উটের পিঠ থেকে বর্মটি পড়ে গেলে সে তা তুলে নিয়েছিল। সুতরাং বর্মটির প্রকৃত মালিক সে নয় বরং হজরত আলী (রা.)। এ ঘটনা লোকটির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। কিছুদিন পর লোকটি ইসলামের শিক্ষা ও হজরত আলী (রা.)-এর ন্যায়পরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হজরত আলী (রা.) ছিলেন জ্ঞানের ভান্ডার। তিনি ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম। 'দিওয়ানে আলী' নামে তাঁর রচিত কবিতার একটি সংকলন রয়েছে। সামরিক দক্ষতার পাশাপাশি তিনি ইসলামি আইন ও ধর্মীয় জ্ঞানের বিষয়েও বিখ্যাত ছিলেন। মহানবি (স.) তাঁর গুণের প্রশংসা করেছিলেন।

হজরত আলী (রা.) ছিলেন খুবই বিনয়ী ও নিরহংকারী। যে কেউ সহজে তাঁর কাছে যেতে এবং তাঁর সহায়তা নিতে পারতেন। তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করতে পারি। সততা ও ন্যায়বিচারের প্রতি সম্মান দেখাতে পারি। সবার সঙ্গে নম্র ও নিরহংকারী আচরণ করতে পারি। অসহায় ও দুর্বল লোকদের সহায়তা করতে পারি।

ক) হজরত আলী (রা.)-এর জীবনাচরণের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে একটি অনুচ্ছেদ লিখি। কাজটি একাকী করি।

খ) হজরত আলী (রা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আমরা নিজেরা যে কাজগুলো করব তার একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

হজরত ফাতেমা (রা.)

হজরত ফাতেমা (রা.) ছিলেন মহানবি (স.) ও হজরত খাদিজা (রা.)-এর কনিষ্ঠ কন্যা। তিনি ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি উত্তম চরিত্র, ধার্মিকতা, জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'সায়্যিদাতুন নিসা'।

মহানবি (স.)-এর নবুয়ত লাভের পরই হজরত ফাতেমা (রা.) তাঁর মাতা ও অন্য বোনদের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিতা হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর ধর্মীয় কাজে সহায়তা করেন। এছাড়াও ইসলামের বাণী প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মহানবি (স.)-এর কষ্ট ও নিপীড়নের সময় তিনি তাঁর পাশে থেকে সান্ত্বনা দিতেন।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স.) হজরত আলী (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। স্বামীর পরিবারে গৃহস্থালির সকল কাজ তিনি নিজ হাতে করতেন। হজরত আলী (রা.) ও হজরত ফাতেমা (রা.)-এর হাসান, হুসাইন, জয়নব ও কুলসুম নামে ৪ জন সন্তান ছিল। মহানবি (স.) তাদেরকে খুব ভালোবাসতেন।

জীবনাদর্শ

হজরত ফাতেমা (রা.) অসাধারণ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তাকওয়া ও মহান আল্লাহর প্রতি ভক্তির জন্য তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর দিকনির্দেশনা ও দয়া কামনা করতেন। তিনি মহান আল্লাহর স্মরণেই বেশিরভাগ সময় ব্যয় করতেন।

হজরত ফাতেমা (রা.) অসহায়দের প্রতি তাঁর সহানুভূতির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই দরিদ্র ও সহায়-সম্বলহীনদের নানা ধরনের সহায়তা প্রদান করতেন। অভাবীদের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উদারহস্তে দান করতেন। একবার এক দরিদ্র আরব বৃদ্ধ তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আসেন। তাকে দেওয়ার মতো ঘরে তেমন কিছু ছিল না। তখন তিনি তাঁর নিজের গলার হারটি খুলে বৃদ্ধকে দিয়ে দিলেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি তাঁর নিজের সকল আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেছিলেন।

হজরত ফাতেমা (রা.) কঠিন সময়েও মহান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও ভরসা রেখেছেন। সারাজীবন তিনি বহু কষ্ট সহ্য করেছেন। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি সকল সমস্যা মোকাবিলা করেছেন। তাঁর এসব উদাহরণ আজও মু'মিনদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

জিহাদের ময়দানে হজরত ফাতেমা (রা.) বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। উহুদ যুদ্ধে মহানবি (স.) মুখে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হলে রক্ত ঝরতে থাকে। হজরত ফাতেমা (রা.) তখন খেজুরের চাটাইয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তার নিরাময়ের জন্য ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

ইসলামের জন্য হজরত ফাতেমা (রা.)-এর অবদান অপরিসীম। মহানবি তাঁকে তাঁর অবদানের জন্য জান্নাতে নারীদের সর্দার হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি তাঁর কথাবার্তা ও আচার-আচরণসহ প্রতিটি

ক্ষেত্রে মহানবি (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ করতেন। এজন্য তাঁকে মহানবি (স.)-এর উত্তম প্রতিচ্ছবি বলা হয়েছে। মহানবি (স.)-এর ইন্তিকালের কিছুদিন পরই তিনি ইন্তিকাল করেন।

হজরত ফাতেমা (রা.) ছিলেন আলোকময় এক মহীয়সী নারী এবং মুসলমানদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর ধার্মিকতা, সহানুভূতি ও ধৈর্য আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আমরা সর্বদা তাঁর আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করব। আমরা বিপদে ধৈর্যধারণ করব। ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখব। নিজের কাজ নিজে করব। আর্থিক প্রতিকূলতা ও কষ্টের মধ্যে ধৈর্যধারণ করব।

ক) আমরা হজরত ফাতেমা (রা.)-এর জীবনাচরণ সম্পর্কে জানলাম। এবার তাঁর জীবনাচরণের বিভিন্ন ঘটনা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করে একটি অনুচ্ছেদ লিখি। কাজটি একাকী করি।

খ) হজরত ফাতেমা (রা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আমরা নিজেরা যে কাজগুলো করতে পারি তার একটি তালিকা পোস্টারে তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

পোস্টার

অনুশীলনী - ২

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও:

(ক) হজরত দাউদ (আ.)-এর ওপর কোন আসমানি কিতাব নাযিল হয়?

১. কুরআন ২. ইনজিল
৩. যাবুর ৪. তাওরাত

(খ) হজরত ঈসা (আ.) কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন?

১. মিশর ২. বেথেলহেম
৩. কাতার ৪. সৌদি আরব

(গ) কোন গুণের কারণে মহানবি (স.)-কে আল-আমিন বলা হত?

১. সততা ২. সত্যবাদিতা
৩. বিশ্বস্ততা ৪. সহনশীলতা

(ঘ) মহানবি (স.) কত খ্রিষ্টাব্দে মদীনায় হিজরত করেন?

১. ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ২. ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে
৩. ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে ৪. ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে

(ঙ) 'জুন্নুরাইন' বা দুই নূরের অধিকারী হিসেবে কে পরিচিত ছিলেন?

১. হজরত আবু বকর (রা.) ২. হজরত উসমান (রা.)
৩. হজরত উমর (রা.) ৪. হজরত আলী (রা.)

(চ) 'সায়্যিদাতুন নিসা' কার উপাধি?

১. হজরত রুকাইয়া (রা.) ২. হজরত জয়নব (রা.)
৩. হজরত ফাতেমা (রা.) ৪. হজরত আয়েশা (রা.)

(ছ) 'আসাদুল্লাহ' কার উপাধি?

১. হজরত আবু বকর (রা.) ২. হজরত উসমান (রা.)
৩. হজরত উমর (রা.) ৪. হজরত আলী (রা.)

২. শূণ্যস্থান পূরণ

ক) হজরত আলী (রা.) ছিলেন খুবই ---------- ও নিরহংকারী।

খ) হজরত উসমান (রা.)-এর আদর্শ অনুসরণে জনকল্যাণে আর্থিক ---------- করব।

গ) মহানবি (স.)-এর আদর্শ অনুসরণে সততা ও ---------- সঙ্গে দায়িত্ব পালন করব।

ঘ) হজরত উসমান (রা.) ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদিনের ---------- খলিফা।

ঙ) হজরত দাউদ (আ.) খুবই বিনয়ী ও ---------- ছিলেন।

চ) হজরত ফাতেমা (রা.)-এর অনুসরণে আর্থিক প্রতিকূলতা ও কষ্টের মধ্যে ---------- করব।

৩. বাম পাশের সাথে ডান পাশ মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. বাদশাহ তালুত তাঁর কন্যাকে	অসুস্থ রোগীদের সেবা করব।
খ. হুদায়বিয়ার সন্ধি হলো	হজরত খাদিজা (রা.)-এর কনিষ্ঠ কন্যা।
গ. সম্পূর্ণ কুরআন সংকলন করেন	সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।
ঘ. হজরত ঈসা (আ.)-এর অনুসরণে	একটি শান্তিচুক্তি।
ঙ. হজরত ফাতেমা (রা.)	হজরত দাউদ (আ.)-এর সঙ্গে বিবাহ দেন।
	হজরত উসমান (রা.)।

৪. শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়

ক) হজরত দাউদ (আ.) আরবের কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

খ) 'আল-আমিন' ছিল হজরত ঈসা (আ.)-এর উপাধি। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

গ) হযরত উসমান (রা.)-এর আদর্শ ছিল জনকল্যাণমূলক কাজ করা। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঘ) ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে হজরত মুহাম্মদ (স.) মিরাজে গমন করেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঙ) হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা বিশ্বস্ত হতে পারি। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) হজরত দাউদ (আ.) কে ছিলেন?

খ) হজরত ঈসা (আ.)-এর দুইটি আদর্শ উল্লেখ করো।

গ) হজরত উসমান (রা.)-এর দুইটি আদর্শ লেখো।

ঘ) মহানবি (স.) হজরত আলী (রা.)-কে কেন জুলফিকার নামক তরবারি উপহার দেন?

ঙ) মুহাজির কাদের বলা হয়?

৬. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) হজরত ঈসা (আ.)-এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করো।

খ) হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর যৌবনকালের আদর্শ আমরা কীভাবে অনুশীলন করতে পারি? ব্যাখ্যা করো।

গ) হজরত আলী (রা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা কোন কোন কাজগুলো করব? একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

ঘ) হজরত ফাতেমা (রা.)-এর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষণীয় পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করো।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন

আত্মত্যাগ

আমরা সমাজে বসবাস করি। সমাজে আমাদের সঙ্গে আরো অনেক মানুষ বসবাস করেন। আমরা সমাজে চলতে গিয়ে কিছু নিয়ম-নীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ অনুসরণ করি। এ থেকে আমাদের মধ্যে যে গুণাবলি তৈরি হয়, সেগুলো হচ্ছে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলির উদাহরণ। আবার বিনয়, স্নেহ-মমতা, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলির উদাহরণ। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ বজায় রাখতে আমাদের এই গুণাবলি অর্জন করতে হয়। আত্মত্যাগ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, দেশপ্রেম, সহানুভূতি, পরোপকার ইত্যাদি মানবিক গুণের চর্চা ও অনুশীলন আমাদের প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে সহায়তা করে। আমাদের সবার উচিত নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির চর্চা করা। এ পাঠে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও মানবিক গুণ 'আত্মত্যাগ' সম্পর্কে জানব।

নিজের পছন্দের কিছু ত্যাগ করাকেই বলে আত্মত্যাগ। সাধারণত ত্যাগ বলতে বোঝায় কারো জন্য কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া। যা নিজের জন্য প্রয়োজন তা অন্যের ভালো বা খুশির জন্য ছেড়ে দেওয়াকে আত্মত্যাগ বলে। ইসলাম আত্মত্যাগের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানব জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যেসব নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন তাঁরা আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। মহানবি (স.) ও তাঁর সাহাবিগণ আত্মত্যাগের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

আত্মত্যাগ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশনা রয়েছে। এসব নির্দেশনা আমাদের উদারতা, সহমর্মিতা এবং অপরের কল্যাণে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ বলেন–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

উচ্চারণ: লান তানা-লুল বিররা হাত্তা-তুনফিকু মিম্মা-তুহিব্বুনা ওয়ামা-তুনফিকু মিন শাইইন ফাইন্নাল্লা-হা বিহী আলিম।

অর্থ: তোমরা যা ভালোবাসো তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনোই সাওয়াব লাভ করবে না এবং তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ তা অবগত আছেন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯২)

এই আয়াতে প্রিয়বস্তু দান করার মাধ্যমে সৎকর্ম ও প্রকৃত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই আয়াত যখন নাজিল হয় তখন প্রখ্যাত সাহাবি হজরত আবু তালহা (রা.) ছুটে গিয়ে হজরত মুহাম্মদ (স.)-কে বললেন– "হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ তো আমাদের নিজেদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস থেকে ব্যয় করার আদেশ দিয়েছেন। 'বাইরুহা' আমার সবচেয়ে প্রিয় বাগান। আমি বাইরুহাকে আল্লাহর জন্য দান করে দিলাম।" রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, "নিকটাত্মীয়দের কাউকে দিয়ে দাও।" অতঃপর তিনি বাগানটি হাসসান বিন সাবিত ও উবাই ইবনে কাবকে দিয়ে দেন। (সহিহ মুসলিম)

মহানবি (স.) নিজ জীবনে আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। মক্কায় ইসলাম প্রচার করতে গেলে কুরাইশরা তাঁকে বাধা দেয় এবং এর বিনিময়ে বিভিন্ন মূল্যবান পার্থিব সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রলোভন দেখায়। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি ইসলামের স্বার্থে তিনি নিজের জীবনও বিপন্ন করে তোলেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি নিজের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের আরাম-আয়েশ পরিহার করে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনি মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হয়েও অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। নিজের পরিবারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেন এবং নিজের চাহিদা কমিয়ে সমাজের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতেন। সমাজের দুর্বল ও বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। এসব কাজের মধ্য দিয়ে তিনি আত্মত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

মহানবি (স.)-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর সাহাবিগণও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন মহানবি (স.)-এর সাহাবি এবং ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি তাঁর ধনসম্পদ ইসলামের জন্য অকাতরে দান করেন। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ছিল তাবুকের যুদ্ধ। যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ইসলামের স্বার্থে এই যুদ্ধে হজরত আবু বকর (রা.) তাঁর সর্বস্ব এনে রাসুল (স.)-এর কাছে উপস্থিত করেন। হজরত উমর (রা.) তাঁর সম্পদের অর্ধেক দান করেন। হজরত উসমান (রা.) ৯০০ উট, ১০০ ঘোড়া, প্রায় সাড়ে ৫ কেজি স্বর্ণমুদ্রা, প্রায় ২৯ কেজি রৌপ্যমুদ্রা দান করেন এবং দশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন।

মহানবি (স.) ও তাঁর সাহাবিগণের দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা আত্মত্যাগমূলক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করব। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আত্মত্যাগ ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসে। আত্মত্যাগের ফলে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। আত্মত্যাগ আমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে এবং সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রাখে। তাই যারা নিঃস্ব, অসহায়, দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত তাদের জন্য আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিব। অন্যের কল্যাণের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করব এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যের পছন্দ, চাহিদা, মতামত ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দিব।

ক) মহানবি ও সাহাবিদের দৃষ্টান্ত আলোচনা করে আত্মত্যাগ সম্পর্কিত কাজের তালিকা তৈরি করি। কাজটি একাকী করি।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

খ) মহানবি ও সাহাবিদের দৃষ্টান্তের আলোকে আত্মত্যাগ সম্পর্কিত কাজের ভূমিকাভিনয় করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

গ) ইসলামের আলোকে আত্মত্যাগের উপকারিতাসমূহের একটি তালিকা করি। কাজটি জোড়ায় করি।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ হলো একে অপরকে সম্মান ও মূল্যায়ন করা। পরস্পরের মতামত, অনুভূতি ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। এর ফলে মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সমাজের সকলের মধ্যে সহানুভূতিশীল মনোভাব তৈরি হয়।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ একটি মানবিক গুণ। মানুষ হিসেবে একে অন্যকে সম্মান করা আমাদের সবার দায়িত্ব। সমাজের প্রতিটি পেশার মানুষের সম্মান রয়েছে। তাই সমাজের ছোটো-বড়ো সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা প্রয়োজন। সমাজের প্রতিটি মানুষকে তার নিজ অবস্থান অনুযায়ী সম্মান করতে হয়। সেই সঙ্গে তাদের মতামতের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এর মাধ্যমে আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বাড়াতে পারি। মানুষ হিসেবে একে অপরকে সম্মান করা, অন্যের পছন্দ-অপছন্দকে প্রাধান্য দেওয়া, কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করা ইত্যাদি ভালো গুণও শ্রদ্ধাবোধের অংশ।

পরিবারে ছোটো-বড়ো সবাইকে নিয়ে আমরা বসবাস করি। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পরিবারে সুখ বয়ে আনে। বাবা-মা আমাদের অতি আপনজন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাঁরা আমাদের অতি স্নেহ-আদরে লালন-পালন করেন। তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখালে তাঁরা খুব কষ্ট পান।

অহংকারী ও দাম্ভিক লোকেরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অনুশীলন করে না। ফলে মানুষ এদেরকে পছন্দ করে না। মহান আল্লাহও তাদের পছন্দ করেন না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

উচ্চারণ: ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বু মান কানা মুখতালান ফাখুরা।

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে অহংকারী ও দাম্ভিক। (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬)

মহানবি (স.) নিজে বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করেছেন। আমাদেরও বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বহু হাদিসেও পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও সর্বস্তরের মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তাগিদ রয়েছে। মহানবি (স.) বলেছেন– "যে ছোটোদের স্নেহ করে না এবং বড়োদের সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (জামে তিরমিজি)

মহানবি (স.)-এর সাহাবিগণও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করতেন। প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি সকল সাহাবির গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল। দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর ন্যায়বিচারে সাহাবিগণ ভরসা রাখতেন। খলিফা হয়েও হজরত উমর (রা.) তাফসীরের জ্ঞানে দক্ষ হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বিশেষ মর্যাদা দিতেন।

পবিত্র কুরআন, হাদিস ও সাহাবিগণের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অনুশীলন করব। আমাদের উচিত হবে মানুষ হিসেবে একে অপরকে সম্মান করা। অপরের ভালোলাগা-খারাপলাগাকে

বিবেচনায় নেওয়া। কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করা। অন্যের কথা মনোযোগের সঙ্গে শোনা। আমরা সর্বদা পিতা-মাতা ও প্রবীণদের সম্মান করব। সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নবান হব। আপনজন, সহপাঠী ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব। বড়োদের সালাম দিব। ছোটোদের স্নেহ ও ভালোবাসা দিব। সকলের প্রতি বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল হব। শিক্ষককে সম্মান করব। তাঁদের কথামতো চলব। তাঁরা মনে কষ্ট পান, এমন কোনো কাজ করব না। এভাবে আমাদের কাজে ও আচরণে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের গুণ অনুশীলন করব।

ক) মহানবি ও সাহাবিদের দৃষ্টান্তের আলোকে সহপাঠী, পরিবার ও পরিবারের বাইরে সবার সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কিত আচরণের তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

খ) মহানবি ও সাহাবিদের জীবনের দৃষ্টান্তের আলোকে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কিত চিত্র ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করি। কাজটি দলে করি।

গ) আমরা নবি ও সাহাবিদের জীবনের দৃষ্টান্তের আলোকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবার সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কীভাবে অনুশীলন করব তার তালিকা তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

পরমতসহিষ্ণুতা

পরমত অর্থ অপরের মত। সহিষ্ণুতা অর্থ সহনশীলতা। পরমতসহিষ্ণুতা হলো বিভিন্ন মত, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করার মানসিকতা। এটি অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করাকে বোঝায়। অর্থাৎ অন্যের মনোভাব, মতামত বা বিশ্বাসের সঙ্গে একমত না হয়েও সেসবের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করাকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও ধর্মের মানুষ বাস করে। সবার মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। আমরা অন্যের মতামতের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করব।

ইসলাম পরমতসহিষ্ণুতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সকল মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং মানুষের মতামতের প্রতি সহনশীল হওয়া ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। পবিত্র কুরআনে অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতিতে আঘাত না করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

উচ্চারণ: ওয়া লা- তাছুব্বুল্লাযিনা ইয়াদউনা মিন্ দুনিল্লাহি ফাইয়াছুব্বুল্লাহা আদওয়াম বিগাইরি ইলমিন।

অর্থ: আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে। (সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১০৮)

মহান আল্লাহর ৯৯টি নামের মধ্যে একটি নাম হলো 'আল-হালিম'। আল-হালিম অর্থ সহনশীল, ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু ইত্যাদি। মহান আল্লাহ তার বান্দাকে পাপ করার সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি দেন না। তাকে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য অবকাশ দেন। তার এই গুণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা।

মহানবি (স.) বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবিদের মতামত নিতেন এবং তাদেরকে মত প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করতেন। উহুদ যুদ্ধের সময় মহানবি (স.)-এর নিজেরসহ কয়েকজন সাহাবির মত ছিল মদিনা শহরের অভ্যন্তরে অবস্থান করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া; কিন্তু হজরত হামযাহ (রা.) এবং অপেক্ষাকৃত যুবক সাহাবিগণ শহরের বাইরে কোনো উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি নিজের মতকে প্রাধান্য না দিয়ে তাদের এ মতামত গ্রহণ করে মদিনার বাইরে উহুদের প্রান্তরে কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ ঘটনার মাধ্যমে অন্যের মতামতের প্রতি মহানবি (স.)-এর গুরুত্ব প্রদানের মনোভাব প্রকাশ পায়। তাঁর আদর্শের অনুসরণে মহানবি (স.)-এর খলিফাগণও তাঁদের শাসনামলে অন্যের মতামত ও বিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ ছিলেন। ইতিহাসে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। একবার হজরত উমর (রা.) বললেন, নারীদের মোহরানার পরিমাণ বেশি না হওয়াই ভালো। তখন একজন নারী তাঁর এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। হজরত উমর (রা.) নিজের মতামত প্রত্যাহার করে উক্ত নারীর মতামতকে সঠিক বলে গ্রহণ করেন।

পরমতসহিষ্ণুতার সুফল অনেক। এটি নিঃসন্দেহে মানবিক গুণাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একটি গুণ। মানুষের মধ্যে এ গুণটি থাকলে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় থাকে। সংঘাত ও হিংসা কমে যায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি পায়। সকলে মিলেমিশে থাকতে পারে। সকলের মাঝে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। সমাজে নানান মতাদর্শের মানুষ বসবাস করেন। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল

মানুষের মতামত ও আদর্শের প্রতি সহিষ্ণুতা থাকলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুন্দর ও সুখী জীবনের জন্য পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব অপরিসীম। অপরের কথা যতই বিরক্তিকর হোক, তা সহ্য করার ধৈর্য বজায় রাখতে হবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইসলামে তাই মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শনের জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

আমরা ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব। আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সহপাঠী ও বন্ধু-বান্ধব কোনো বিষয়ে আমাদের সঙ্গে দ্বিমত করতে পারেন। আমরা তাদের যৌক্তিক মতামত ধৈর্যসহ শুনব। অযথা তাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া ও বিবাদে লিপ্ত হব না। যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতামত সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব। আমরাও যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মতামত উপস্থাপন করব। অন্যের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করব। নিজের মতের সঙ্গে না মিললেও অন্যের মতামত ও অনুভূতির প্রতি সহানুভূতি জানাব। কেউ আমাদের মতামতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে বিবাদে জড়াব না। সহনশীল থাকার চেষ্টা করব। এভাবে পরমতসহিষ্ণুতার জন্য আমরা ইসলামের নীতি ও নৈতিকতা মেনে চলব।

ক) মহানবি (স.) ও সাহাবিদের দৃষ্টান্তসমূহ আলোচনা করে পরমতসহিষ্ণুতার সুফলসমূহের তালিকা তৈরি করি। কাজটি একাকী করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

খ) আমরা কীভাবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পরমতসহিষ্ণুতা অনুশীলন করতে পারি, তা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করে দেখাই। কাজটি দলগতভাবে করি।

গ) মহানবি (স.) ও সাহাবিগণের দৃষ্টান্তের আলোকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরমতসহিষ্ণুতা কীভাবে অনুশীলন করব, তা ব্যাখ্যা করি। কাজটি জোড়ায় করি।

দেশপ্রেম

মানুষ যে ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে বা স্থায়ীভাবে বসবাস করে, সে ভূখণ্ডই তার দেশ। সে তার দেশকে ভালোবেসে তার কল্যাণে কাজ করে। নিজের দেশ এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসা ও তাদের কল্যাণে কাজ করাই হচ্ছে দেশপ্রেম। দেশপ্রেম একটি মহৎ গুণ।

চিত্র: জাতীয় পতাকা হাতে শিশুরা

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রিয় জন্মভূমি ছিল পবিত্র মক্কা নগরী। তিনি মক্কা নগরীকে খুব ভালোবাসতেন। মক্কাবাসীদেরও খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার আহ্বান জানাতেন। নিজের দেশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে মক্কাবাসী তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু করে। তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তখন তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে নিজের জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন।

হিজরতের সময় নিজের জন্মভূমি ছেড়ে যেতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। তিনি অশ্রুভেজা চোখে মক্কার দিকে বারবার ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর কাতর কণ্ঠে বলছিলেন–

“কতই না পবিত্র ও উত্তম শহর তুমি

আমার নিকট তুমি কতই না প্রিয়।

আমার স্বজাতি যদি তোমার নিকট হতে আমাকে বের করে না দিত

তবে আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য কোথাও বসবাস করতাম না।”

(তিরমিজি)

এ হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, স্বদেশের প্রতি মহানবি (স.)-এর ছিল গভীর মমতা ও ভালোবাসা। তাঁর দেশপ্রেম আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

ইসলামের পূর্ববর্তী নবি-রাসুলগণও নিজের দেশকে ভালোবাসতেন। তাঁরা নিজ দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করতেন। হজরত ইবরাহিম (আ.) তাঁর বংশধরদের ও স্বদেশের কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলেছিলেন–

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

উচ্চারণ: রাব্বিজ'আল হাযা বালাদান আমিনাওঁ ওয়ারঝুক আহলাহু মিনাছ্ ছামারাতি মান আমানা মিন্হুম বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! এ ভূখণ্ডকে আপনি নিরাপদ শহরে পরিণত করে দিন। এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদের বিভিন্ন রকমের ফলমূল দিয়ে জীবিকা দান করুন। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৬)

হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর এই দু'আ থেকেও আমরা স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা পাই।

আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের বহু মানুষ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও কল্যাণের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামে নিজেদের জীবনকে বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের এ আত্মত্যাগ আমাদের স্বদেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা জোগায়। নিজের দেশকে ভালোবাসতে ও দেশের কল্যাণে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে শেখায়। দেশের সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য দেশপ্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশপ্রেম আমাদের দেশের আইন মেনে চলতে এবং ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারি। আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারি। আমরা বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজ করতে পারি। দেশপ্রেম আমাদের দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে শেখায়। মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে শেখায়।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা দেশের কল্যাণে নিম্নের কাজগুলো করব–

ক. আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব;
খ. মনোযোগ দিয়ে লেখা-পড়া করব;
গ. দেশের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলব;
ঘ. সততা অবলম্বন করে দুর্নীতি ও অন্যায় থেকে বিরত থাকব;
ঙ. দরিদ্র ও অসহায়কে সহায়তা এবং অসুস্থকে সেবা করব;
চ. বৃক্ষরোপণ করব এবং এর যত্ন নেব;
ছ. যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলব না;
জ. পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মতো জাতীয় সম্পদের অপচয় করব না।

আমরা এসব সুঅভ্যাস গঠনের মাধ্যমে জন্মভূমির উন্নয়নে অবদান রাখব।

ক) নিচের ছকে ইসলামের আলোকে দেশপ্রেমের গুরুত্ব লিখি। কাজটি একাকী করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

খ) আমরা চারপাশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ সংরক্ষণে কী কী ভূমিকা পালন করব তার একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

গ) দেশকে ভালোবেসে দায়িত্বশীল আচরণের ভূমিকাভিনয় করি। কাজটি জোড়ায় করি।

অনুশীলনী - ৩

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও:

(ক) আত্মত্যাগ কী?

১. নিজের লাভ চাওয়া
২. অন্যের ভালো চাওয়া
৩. নিজের পছন্দের কিছু ত্যাগ করা
৪. শুধু নিজের কথা ভাবা

(খ) পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কী ধরনের গুণ?

১. মানবিক
২. সর্বোত্তম
৩. স্বভাবজাত
৪. নৈতিক

(গ) তোমার বন্ধুর সঙ্গে পরমতসহিষ্ণুতার গুণ কীভাবে চর্চা করবে?

১. তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে
২. তার মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে
৩. তার মতামতকে উপেক্ষা করে
৪. তাকে মতামত প্রদানে নিরুৎসাহিত করে

(ঘ) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা কোন কাজটি করব?

১. দেশের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলব
২. দেশের মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজব
৩. দেশের ব্যর্থতাকে উপেক্ষা করব
৪. দেশের অকল্যাণ মেনে নেব

(ঙ) পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সুফল কী?

১. পরোপকার
২. দানশীলতা
৩. দেশপ্রেম
৪. সুসম্পর্ক

২. শূণ্যস্থান পূরণ

ক) আত্মত্যাগ আমাদের ----------ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে।

খ) সমাজের প্রতিটি মানুষকে তার নিজ অবস্থান অনুযায়ী ---------- করতে হয়।

গ) আমরা অন্যের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ---------- প্রদর্শন করব।

ঘ) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ---------- পরিবেশ বজায় রাখব।

ঙ) পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ হলো মানুষ হিসেবে একে অপরকে সম্মান ও ---------- করা।

৩. বাম পাশের সাথে ডান পাশ মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. নিজের প্রিয় জিনিস বিসর্জন দেয়া	শ্রদ্ধাশীল আচরণ করব।
খ. নবি-রাসুলগণ আত্মত্যাগের	দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারি।
গ. আমরা সমাজের ছোটো-বড়ো সবার প্রতি	অন্যের মত অনুযায়ী চলব।
ঘ. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা	আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।
ঙ. আমরা অন্যের মতের সাথে একমত না হলেও	হলো আত্মত্যাগ
	তার মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব।

৪. শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়

ক) নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
খ) আত্মত্যাগ আমাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট বয়ে আনে। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
গ) মানুষ হিসেবে সবাই সমানভাবে সম্মানীয় নয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
ঘ) দেশকে ভালোবাসা ও দেশের কল্যাণে কাজ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
ঙ) দেশপ্রেম আমাদের সাম্য ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) আত্মত্যাগ কী?
খ) আত্মত্যাগের দুইটি উদাহরণ লেখো।
গ) পরমতসহিষ্ণুতার দুইটি সুফল লেখো।
ঘ) পরিবারে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ চর্চার দুটি উদাহরণ লেখো।
ঙ) দেশপ্রেম কী?

৬. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) আত্মত্যাগের উপকারিতা সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করো।
খ) পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কিত চারটি কাজের বিবরণ দাও।
গ) নবি ও সাহাবিগণের দৃষ্টান্তের আলোকে কীভাবে পরমতসহিষ্ণুতা অনুশীলন করবে?
ঘ) দেশপ্রেমের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।
ঙ) তুমি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ কীভাবে সংরক্ষণ করবে?

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মীয় সম্প্রীতি

ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিচয় ও গুরুত্ব

সম্প্রীতি অর্থ সৌহার্দ, সদ্ভাব, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি। ধর্মীয় সম্প্রীতি হলো সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মিলেমিশে ও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস। ধর্মীয় সম্প্রীতি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে। বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ। এদেশে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করে।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতি ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য ইসলাম আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে। ন্যায়বিচার ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সকল মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

উচ্চারণ: ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম শানাআ-নু কাওমিন ‘আলা আল্লা তা‘দিলূ ই‘দিলূ হুয়া আকরাবু লিত্তাকওয়া।

অর্থ: কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের প্ররোচিত না করে যে তোমরা ন্যায়বিচার করবে না। ন্যায়বিচার অবলম্বন করো। এটাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৮)

পবিত্র কুরআনের এ শিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হব। সব ধর্মের মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার, দয়া, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করব। তাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করব না। তাদের সঙ্গে ভদ্র ও বিনয়ী আচরণ করব। এভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করব।

ক) ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

মদিনা সনদ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি

মদিনা সনদ

বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তোলার জন্য মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ ছিল 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন। এর মাধ্যমে তিনি মদিনায় বসবাসরত মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তুলেছিলেন।

মহানবি (স.)-এর হিজরতের পূর্বে মদিনায় ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিকসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করত। সুদীর্ঘকাল ধরে সেখানে তাদের মধ্যে মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে আসছিল। এমতাবস্থায় মদিনা থেকে একটি প্রতিনিধি দল মহানবি (স.)-কে নেতা ও সালিশকারী হিসেবে মদিনায় আমন্ত্রণ জানায়। পরবর্তীকালে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন।

মদিনায় হিজরতের পর মহানবি (স.) দেখলেন যে, মদিনার শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে অনতিবিলম্বে ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্য তিনি মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন।

মদিনা সনদকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেমন– সহিফাত আল মদিনা, দুস্তুর আল-মদিনা, কিতাব আল-রাসুল, মীসাক আল-মদিনা ইত্যাদি। এ সনদের ফলে সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে ওঠে। সবাই একজাতি হিসেবে মিলেমিশে বসবাস করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। এর ফলে সকল ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার লাভ করে।

মদিনা সনদে বর্ণিত অন্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার

মহানবি (স.) কর্তৃক প্রণীত মদিনা সনদে ৪৭টি মতান্তরে ৫৭টি কিংবা ৬৩টি ধারা রয়েছে। এসব ধারায় মদিনায় বসবাসরত সকল ধর্মের মানুষের মৌলিক ও মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়।

মদিনা সনদের ধারাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৫টি হলো–

১. এটি মহানবি মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক জারিকৃত একটি দলিল, যার ভিত্তিতে মুসলিম ও অমুসলিমগণের মধ্যে যারা এর অনুসারী হবে কিংবা তাদের সঙ্গে কাজকর্ম বা লেনদেনে আবদ্ধ হবে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হবে। তারা সবাই মিলে একটি জাতিগোষ্ঠী, একটি সমাজ ও একটি রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. আল্লাহর নামে কোনো মু'মিন কাউকে সুরক্ষা দিলে তা সবার জন্যই মান্য ও প্রযোজ্য হবে। মু'মিনদের মধ্যে দুর্বলতম কেউ যদি কাউকে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব মু'মিনের জন্য অবশ্যপালনীয় হবে।

৩. ইহুদিদের মধ্যে যারা মু'মিনদের মিত্র হবে তাদের ওপর অত্যাচার করা হবে না এবং তাদের শত্রুদের কোনো সাহায্য করা হবে না।

৪. বনু আউফের ইহুদিরা মু'মিনদের সঙ্গে এক সমাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। ইহুদিদের জন্য তাদের নিজস্ব ধর্ম থাকবে এবং মু'মিনদের জন্য তাদের নিজস্ব ধর্ম থাকবে।

৫. বনু সা'লাবার ইহুদিদেরও বনু আওফের ইহুদিদের মতই অধিকার থাকবে; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায় করবে বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সে কেবল নিজের এবং তার পরিবারের জন্যই মন্দ নিয়ে আসবে।

উপরের ধারাগুলোতে যেসব অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

১. মুসলমানদের পাশাপাশি ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নিজস্ব জাতিসত্তা, সমাজ ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার প্রদান করা।

২. মুসলমানদের পাশাপাশি অন্য ধর্মের অনুসারীদের একই জাতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. প্রত্যেক ধর্মের মানুষের নিজস্ব ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করা।

৪. সকলের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পত্তির সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া।

৫. সকলকে নিজেদের ধর্মচর্চার স্বাধীনতা দেওয়া। জোরপূর্বক কাউকে ধর্মান্তরিত না করা।

৬. ন্যায়বিচারের নীতি অনুসারে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের জন্য বিরোধ নিষ্পত্তির অধিকার প্রদান করা।

৭. সকল ধর্মের দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তির জন্য সাহায্য ও সুরক্ষার অধিকার প্রদান করা।

এভাবে মদিনা সনদে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিভিন্ন অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে মদিনার বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হয়।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার রক্ষা ও তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য মদিনা সনদ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। আমরা মদিনা সনদের শিক্ষাগুলোকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করব। সকল ধর্মের মানুষের মতামত ও অনুভূতির প্রতি সহনশীল হব। তাদের ধর্ম, জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের ক্ষতি হয় এমন সকল কাজ থেকে বিরত থাকব। ভিন্ন ধর্মের সহপাঠীদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসব।

ক) মদিনা সনদ-এ বর্ণিত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকারের একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি।

ক্রমিক	মদিনা সনদে বর্ণিত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

খ) মদিনা সনদ অনুসারে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চিত্র ভূমিকাভিনয় করে দেখাই। কাজটি দলে করি।

অনুশীলনী - ৪

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও:

(ক) ধর্মীয় সম্প্রীতির অর্থ কী?

১. বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মিলেমিশে না থাকা ২. ভিন্ন ধর্মের মানুষদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন
৩. বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ৪. কেবল মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা

(খ) পবিত্র কুরআনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করার নির্দেশনা রয়েছে?

১. শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করা ২. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা
৩. জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা ৪. অন্যের ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা

(গ) নিম্নের কোনটি মদিনা সনদের শিক্ষা নয়?

১. নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ২. জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত না করা
৩. একমাত্র মুসলমানদের নিরাপত্তা ৪. ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখা

(ঘ) ইসলামের শিক্ষা অনুসারে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত?

১ অসহযোগিতামূলক ২. সহানুভূতিশীল
৩. অবজ্ঞাসূচক ৪. শত্রুতামূলক

(ঙ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আমাদের করণীয় কী?

১. অন্যদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে বিদ্রুপ করা ২. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করা
৩. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সম্মান না করা ৪. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এড়িয়ে চলা

২. শূণ্যস্থান পূরণ

ক) বাংলাদেশ ---------- সম্প্রীতির দেশ।

খ) আমরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ভদ্র ও ---------- আচরণ করব।

গ) ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য ---------- গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ) মদিনা সনদ অনুযায়ী মুসলিম ও অমুসলিমরা এক ---------- হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

ঙ) ভিন্ন ধর্মের সহপাঠীদের যেকোনো ---------- এগিয়ে আসতে পারি।

চ) আমরা সকল ধর্মের মানুষের মতামত ও অনুভূতির প্রতি ---------- হব।

৩. বাম পাশের সাথে ডান পাশ মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. ধর্মীয় সম্প্রীতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে	ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য।
খ. ইসলাম ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য	ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা প্রদান করা উচিত।
গ. মহানবি (স.) মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন	সহমর্মিতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।
ঘ. সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু উভয় নাগরিককে	সকল সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।
ঙ. মদিনা সনদের মূল শিক্ষা হলো	নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা।
	আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

৪. শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়

ক) কুরআনে বলা হয়েছে ন্যায়বিচারই তাকওয়ার নিকটবর্তী। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
খ) মদিনা সনদে কেবল মুসলমানদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
গ) ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য আমরা শুধু মুসলমানদের সাথে সদ্ব্যবহার করব। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
ঘ) ভিন্ন ধর্মের মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা দিয়ে সামাজিক সংহতি গড়ে তোলা যায়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
ঙ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার রক্ষায় মদিনা সনদ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে না। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
চ) ইসলামে অন্য ধর্মের উপাসনালয় ধ্বংসের অনুমতি নেই। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) মদিনা সনদের অপর দুইটি নাম লেখো।
খ) মদিনা সনদে কয়টি ধারা রয়েছে।
গ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তিনটি করণীয় কী?
ঘ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কে তিনটি কাজ লেখো।
ঙ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কে দুইটি বাক্য লেখো।
চ) তোমার শ্রেণিতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সহপাঠীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তিনটি উপায় লেখো।

৬. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) পবিত্র কুরআনে ধর্মীয় সম্প্রীতির কী নির্দেশনা রয়েছে বর্ণনা করো।
খ) মদিনা সনদে বর্ণিত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের চারটি অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করো।
গ) ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করো।
ঘ) তুমি কীভাবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে, তা চারটি বাক্যে লেখো।
ঙ) একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তুমি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে?

পঞ্চম অধ্যায়

জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

আমাদের চারপাশে রয়েছে বিশাল প্রকৃতি ও বিচিত্র জীবজগৎ। এসবই পরম করুণাময় মহান আল্লাহর সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ۭ وَهُوَ عَلٰي جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاۗءُ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: ওয়ামিন আয়াতিহী খালকুছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামা বাছছা ফী-হিমা মিন দা-ব্বাতিন। ওয়াহুয়া আলা জামইয়িহিম ইযা ইয়াশাউ কাদীর।

অর্থ: তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তিনি এ দুয়ের মাঝে যেসব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো। আর যখন ইচ্ছে তিনি তাদেরকে একত্রিত করতে সক্ষম। (সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ২৯)

পবিত্র কুরআনে প্রায় ২০০টি আয়াতে প্রাণিজগতের বিষয়ে উল্লেখ করা রয়েছে। এমনকি বিভিন্ন প্রাণীর নামেও কয়েকটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যেমন– সূরা বাকারা (গাভি), সূরা আন'আম (চতুষ্পদ জন্তু), সূরা নাহল (মৌমাছি), সূরা নামল (পিপীলিকা), সূরা আনকাবুত (মাকড়সা), সূরা ফিল (হাতি) ইত্যাদি। এতে সহজেই বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অপরিসীম!

পৃথিবীর প্রতিটি জীবই কোনো না কোনোভাবে পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আলাদা আলাদা ভূমিকা রয়েছে। আমাদের চারপাশে অনেক রকমের গৃহপালিত পশু রয়েছে। মহান আল্লাহ সেগুলোকে আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ

উচ্চারণ: ওয়াল আনআমা খালাকাহা লাকুম ফীহা দিফউন ওয়া মানাফিউ ওয়ামিনহা তা'কুলূন।

অর্থ: তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ (পশম ও চামড়া) এবং আরো বিবিধ উপকার রয়েছে; আর তা হতে তোমরা আহার করে থাক। (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫)

মানব অস্তিত্ব রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, ওষুধপত্র, কাঠ, বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি আমরা জীবজগৎ থেকে পাই। উদ্ভিদ থেকে আমরা খাদ্যশস্য, ওষুধের কাঁচামাল, তুলা, কাঠ ইত্যাদি পাই। আবার প্রাণী থেকে পাই মাছ, গোশত, দুগ্ধসামগ্রী, চামড়া, মধু ইত্যাদি। আমাদের বাড়িঘর নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরি, জ্বালানি, কাগজ উৎপাদন প্রভৃতি কাজের জন্য আমরা যে কাঠ ব্যবহার করি, তা গাছ থেকে পাই। এককথায় আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, হাওর-বাঁওড়সহ জলাধারগুলো পরিবেশ রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া পরিবেশকে শীতল রাখা, বর্ষা মৌসুমে বন্যা প্রতিরোধ, শহরে জলাবদ্ধতা নিরসন, পানির চাহিদা পূরণ ও আবর্জনা পরিশোধনে জলাভূমিগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

চিত্র: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজন জীববৈচিত্র্য

পরিবেশ দূষণ রোধে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

পরিবেশ দূষণ রোধে জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক। পরিবেশে অক্সিজেনের সরবরাহ ঠিক রাখতে এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটাতে উদ্ভিদের ভূমিকা অপরিহার্য। নদ-নদী ও জলাশয়ে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পানি জমা হয়। সেখানে মাছ ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ সঠিকভাবে বৃদ্ধি পায়। কৃষির জন্যও আমাদের বৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এসবই মহান আল্লাহর দান। এ সম্পর্কে তিনি বলেন–

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا

উচ্চারণ: ওয়াহুয়াল্লাযী আনযালা মিনাছ্ ছামায়ী মাআন। ফাআখরাজনা বিহী নাবাতা কুল্লি শাইয়িন ফাআখরাজনা মিনহু খাদিরা।

অর্থ: তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি। (সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৯৯)

চিত্র: নদী ও প্রকৃতি

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। এদেশের খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, সাগর-নদী, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদিতে রয়েছে নানা প্রজাতির মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ। এগুলো আমাদের জীবনধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই জীববৈচিত্র্য রক্ষার প্রতি আমাদেরকে যত্নশীল হতে হবে।

মহানবি (স.) গাছপালার পরিচর্যা করতেন। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহাবিগণও গাছপালার পরিচর্যা করতেন। হজরত আবু বকর (রা.) সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণের সময় গাছ না কাটা, কৃষিজমি ধ্বংস না করা এবং পশু হত্যা না করার নির্দেশ দিতেন।

বৃক্ষনিধন জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে জলবায়ু বিপর্যয়, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। উদ্ভিদ কমে গেলে অক্সিজেন কমে যায়। খরা ও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। পাখি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে; কিন্তু শীতের মৌসুমে শিকারিরা অতিথি পাখিদের শিকার করে বাজারে বিক্রি করে। অতিথি পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন ও নিরাপত্তার প্রতি আমাদের যত্নশীল হতে হবে। সকল ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর কাজ পরিহার করতে হবে।

ক) পবিত্র কুরআন, হাদিস ও সাহাবিগণের দৃষ্টান্তের আলোকে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে একটি অনুচ্ছেদ লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

মানুষ ও জীবজগতের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা

মানুষ, জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবী সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের জীবন রক্ষা করা যেমন সাওয়াবের কাজ, তেমনি পশুপাখি ও উদ্ভিদের পরিচর্যা করাও সাওয়াবের কাজ। প্রাণিজগৎ সর্বদা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। ইসলাম পশুপাখি ও উদ্ভিদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছে। তাই সকল প্রাণী অবশ্যই পরিচর্যা ও দয়া পাওয়ার অধিকার রাখে।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কোনো প্রাণী যদি বিপন্ন হয় এবং তার অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে, তাহলে তা সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। হজরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের সময় মহান আল্লাহ প্রাণিকুলের অস্তিত্ব রক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন–

إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

উচ্চারণ: ইযা জাআ আমরুনা ওয়াফারাত্তাননূরু কুলনাহমিল ফীহা মিন কুল্লিন যাওজাইনিছ নাইনি।

অর্থ: যখন আমার আদেশ এসে গেল এবং চুলা উথলে (পানিতে) উঠল; আমি (নূহকে) বললাম, তাতে (নৌকায়) প্রতিটি শ্রেণির (প্রাণীর) দুটি করে জোড়া তুলে নাও। (সূরা হুদ, আয়াত: ৪০)

মহানবি (স.) পশুপাখির অধিকার রক্ষায় সোচ্চার ছিলেন। অযথা প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে চড়ুই বা তার চেয়ে ছোটো পাখিকে হত্যা করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।" (সুনানে নাসায়ি)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে এক সফরে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে গেলে আমরা একটি লাল পাখি দেখতে পেলাম। পাখির সঙ্গে দুইটি বাচ্চা ছিল এবং আমরা বাচ্চা দুইটিকে ধরলাম। এসময় মা লাল পাখি তার ডানা দিয়ে মাটিতে আঘাত করছিল। মহানবি (স.) ইতোমধ্যে ফিরে এসে বললেন, কে এই পাখির বাচ্চাদের ধরে এনে কষ্ট দিয়েছে? তাদের ফিরিয়ে দাও। মহানবি (স.) সেখানে একটি পিঁপড়ার ঢিবিও লক্ষ করলেন, যা আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এ আগুন কে দিয়েছে? আমরা উত্তর দিলাম, আমরা দিয়েছি। তিনি বললেন, আগুনের রব ছাড়া আর কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারে না। (রিয়াদুস সালিহিন)

চিত্র: পাখির বাসায় বাচ্চা ও পাশে মা পাখি

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, প্রতিটি দেশে মোট ভূখন্ডের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা জরুরি। কারণ পরিবেশ বিপর্যয়ের বড়ো কারণ হলো ভূখন্ডে পর্যাপ্ত বনভূমি না থাকা। মহানবি (স.) নিজ হাতে গাছ লাগিয়ে পরিচর্যা করতেন। তিনি বৃক্ষরোপণের উপকারিতা উল্লেখ করে সাহাবিগণকেও উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেছেন– "যদি কোনো মুসলমান একটি গাছের চারা রোপণ বা একটি শস্য উৎপন্ন করে এবং তা থেকে কোনো ব্যক্তি, পাখি বা প্রাণী খায় তবে তা উৎপাদনকারীর জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।" (সহিহ বুখারি)

চিত্র: শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের আঙিনায় গাছের চারা রোপণ করছে

পানির অপচয় রোধে মহানবি (স.) খুবই সচেতন ও যত্নবান ছিলেন। "একদা মহানবি (স.) প্রখ্যাত সাহাবি হজরত সা'দ (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি ওজু করছিলেন। মহানবি (স.) বললেন, সা'দ! পানির অপচয় করছো কেন? তিনি (সা'দ) বললেন, ওজুর ক্ষেত্রেও কি পানির অপচয় হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এমনকি তুমি প্রবাহিত পানির পাশে থাকলেও (নদীর পানি বেশি ব্যবহার করলেও পানির অপচয় হবে)।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)

মহানবি (স.) ও তাঁর সাহাবিগণের এসব দৃষ্টান্ত আমাদেরকে মানুষ, জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও দায়িত্বশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে।

মানুষ, জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীকে ভালোবেসে করণীয় কাজ

আমরা যদি পরিবেশের পরিচর্যা ও সংরক্ষণ না করি তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটবে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

উচ্চারণ: জাহারাল ফাসাদু ফিল বার্‌রি ওয়াল বাহরি বিমা কাছাবাত আইদিন্নাছ।

অর্থ: মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে-স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। (সূরা আর-রুম, আয়াত: ৪১)

সুতরাং মানুষ, জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীকে ভালোবেসে তাদের সংরক্ষণের জন্য আমরা নিচের কাজগুলো করতে সচেষ্ট হব–

১. পরিবেশদূষণ রোধ করা;
২. পানির অপচয় রোধ করা;
৩. বেশি করে গাছ লাগানো এবং সেগুলোর যত্ন নেওয়া;
৪. প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা;
৫. সম্পদের অপচয় রোধ করা;
৬. সুষ্ঠুভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করা;
৭. চারপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা করা;
৮. প্রাণীদের অযথা হত্যা না করা;
৯. পশু-পাখিকে কষ্ট না দেওয়া;
১০. নিজ এলাকাবাসীদের উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্নে সচেতন করা।

ক) জীবজগৎ রক্ষায় মহানবি (স.) ও সাহাবিগণের আদর্শ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করি। কাজটি একাকী করি।

খ) জীবজগৎ ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে যেসকল কাজ করব তার একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

অনুশীলনী - ৫

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও:

(ক) নিচের কোন সূরাটি একটি প্রাণীর নামে নামকরণ করা হয়েছে?

১. সূরা ফিল ২. সূরা মাউন
৩. সূরা কুরাইশ ৪. সূরা ইখলাস

(খ) মহান আল্লাহর কোন সৃষ্টি থেকে আমরা অক্সিজেন পাই?

১. গাছপালা ২. পশু-পাখি
৩. পাহাড়-পর্বত ৪. নদ-নদী

(গ) বৃক্ষরোপণের পর তা থেকে উৎপন্ন শস্য কোনো প্রাণী খেলে তা কী হিসেবে গণ্য হয়?

১. উত্তম ঋণ ২. পুরস্কার
৩. সদকা ৪. জাকাত

(ঘ) জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীকে সংরক্ষণের জন্য কোন কাজটি করব?

১. উদ্ভিদ ও প্রাণীর ছবি আঁকা ২. প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিডিয়ো দেখা
৩. উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্ন নেয়া ৪. জীবজগতের গল্প শোনা

(ঙ) একটি বিড়ালকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখলে কোন কাজটি করব?

১. দুঃখ প্রকাশ করব ২. তার খাবারের ব্যবস্থা করব
৩. পাশ কেটে চলে যাব ৪. নীরবে দাঁড়িয়ে থাকব

(চ) পরিবেশের পরিচর্যা না করলে পৃথিবীতে কী ঘটবে?

১. পৃথিবী আরো সুন্দর হয়ে উঠবে ২. মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে
৩. পরিবেশদূষণ বাড়বে ৪. গাছপালা ও পশু-পাখির সংখ্যা বাড়বে

২. শূণ্যস্থান পূরণ

ক) পরিবেশ দূষণ রোধে জীববৈচিত্র্যের ---------- বজায় রাখা আবশ্যক।

খ) মহানবি (স.) নিজে গাছপালার ---------- করতেন।

গ) পরিবেশ রক্ষায় আমরা নিয়মিত গাছের ---------- করব।

ঘ) জীবজগৎ সংরক্ষণের জন্য প্রাণীদের অযথা ---------- করব না।

ঙ) জীবজগৎ ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে আমরা তাদের ---------- করব।

৩. বাম পাশের সাথে ডান পাশ মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. পবিত্র কুরআনে প্রায়	সাওয়াবের কাজ।
খ. উদ্ভিদ কমে গেলে	সচেতন করব।
গ. নিজ এলাকাবাসীকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্নে	একটি ভালো অভ্যাস।
ঘ. পশু-পাখি ও উদ্ভিদের পরিচর্যা করা	২০০টি আয়াতে প্রাণিজগতের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।
ঙ. জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর কাজ	অক্সিজেন কমে যায়।
	পরিহার করতে হবে।

৪. শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়

ক) পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
খ) বৃষ্টিপাত ঘটাতে গাছের কোনো ভূমিকা নেই। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
গ) পানির অপচয় রোধ করার সাথে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কোনো সম্পর্ক নেই। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
ঘ) পরিবেশের পরিচর্যা ও সংরক্ষণ না করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় দেখা দেয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
ঙ) মহানবি (স.) অযথা পশু-পাখিকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) মহান আল্লাহ আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন পাঁচটি সৃষ্টির নাম লেখো।
খ) মহান আল্লাহর সৃষ্ট উদ্ভিদ থেকে আমরা কী উপকার পাই?
গ) হজরত আবু বকর (রা.) যুদ্ধে প্রেরণের সময় সেনাবাহিনীকে কী নির্দেশ দিতেন?
ঘ) পরিবেশ রক্ষায় বিদ্যালয়ে কী কী কাজ করা যায়?

৬. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
খ) মহানবি (স.)-এর জীবনী থেকে জীবজগতের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনের একটি ঘটনা বর্ণনা করো।
গ) জীবজগৎ ও প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য করণীয় আটটি কাজের তালিকা তৈরি করো।
ঘ) জীবজগৎ ও প্রকৃতি রক্ষায় সাহাবিগণের জীবনী থেকে আমরা কী শিখতে পারি বর্ণনা করো।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, পঞ্চম শ্রেণি–ইসলাম শিক্ষা

তোমরা একে অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না।
–আল কুরআন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য